আচার্য ৺বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

সূচী

আচার্য জনার্দন চক্রবর্তী মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা ... ... ।৵০—৸৶০

নিবেদন ... . ৸৶৵০—১৲

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রাক্-কথন . .. .. ১—৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বিদ্যাপতি বিষয়ক আলোচনার ইতিবৃত্ত ... ৫—১৫

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদের সম্ভাব্য রচয়িতাগণ ১৬—৫৮

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সহজিয়া বিদ্যাপতি .. . ... ৫৯—৯৮

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলায় বিদ্যাপতি-পদাবলীর রূপান্তর ... ৯৯—১৫১

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বাংলা দেশে রচিত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদের আলোচনা .. .. ১৫২—১৮৯

পরিশিষ্ট 'ক'—সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা ১৯০

পরিশিষ্ট 'খ'—পুথি-পরিচয় ... ... ১৯১—১৯৫

পরিশিষ্ট 'গ'—অপ্রকাশিত পদগুচ্ছের সূচী ... ... ১৯৬—১৯৮

পরিশিষ্ট 'ঘ'—বিদ্যাপতি চর্চা ... ... ১৯৯—২০৪

ভূমিকা

ছাত্রদের পড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি বই হাতে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিশ্রামকক্ষে এসে বসেছি। পাশে ছিলেন শ্রদ্ধেয় স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলীখানি হাতে নিয়ে যদৃচ্ছাক্রমে প্রথমে বইয়ের যেখানটায় খুললেন সেখানে তাঁর চোখে পড়ল,

"শীতের ওঢ়নি পিয়া গিরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥"

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, এই পদটি কি আপনাদের বিদ্যাপতির লেখা?" তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যের বহুশ্রুত অধ্যাপক-প্রধান। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করবার সূচনা হয়নি তখনও তাঁর। অবশ্য এই বহুমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন অধ্যাপকপ্রবীণের স্বদেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও অনুরাগের অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহ সেদিন হয়ত অন্যের অলক্ষিতে বয়ে চলেছিল। বিনয়প্রকাশের রীতিতে কতকটা নিজেকে অনধিকারী বলে পরিচায়িত করার উদ্দেশ্যে এরূপ বাগ্‌ভঙ্গি অবলম্বন করে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি বললাম, "স্যর, ভণিতা বিদ্যাপতির। পদটি বিদ্যাপতির বলেই আমার বিশ্বাস।" "বিদ্যাপতির ভণিতা থাকলেই কি পদ বিদ্যাপতির হয়? এই পদটি সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাসের যুক্তি কি?"—বোধ হয় পদের ভাষা-বিভক্তি অলঙ্কার প্রভৃতি বহিরঙ্গ-বিচার করে সুধী অধ্যাপক তাঁর সংশয়টি প্রকাশ করেছিলেন।

আমি সশ্রদ্ধভাবে বললাম, "মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়েই বৃন্দাবনের দিকে ছুটে চলেছিলেন, কৃষ্ণান্বেষণে।" "হরেকৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘনে", "মুদল নয়নে ধারা।" নিত্যানন্দপ্রমুখ প্রিয় পার্ষদেরা শোকবিহ্বলা শচীমাতা ও নবদ্বীপের ভক্ত-সমাজের আর্তির কথা ভেবে দিব্যোন্মত্ত সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যমুনা বলে গঙ্গা দেখিয়ে পথ ভাঁড়িয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে এনে হাজির করেছিলেন। নবদ্বীপ উজাড় করে ভক্তগণ ও আলুথালুবেশে শচীমাতা অদ্বৈতগৃহে ছুটে এসেছিলেন। বদ্ধাঞ্জলি পাদপ্রণত সন্ন্যাসি-সন্তানের মুখে 'চুম্ব' দিয়ে তাঁকে বক্ষে ধরে অদ্বৈতভবনের অশ্রুসিক্ত ভূখণ্ডকে সেদিন তিনি স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তা এই মর্মবিদারী মিলনোৎসবের মনোজ্ঞ আলেখ্য চিত্রিত করে গিয়েছেন। অদ্বৈতগৃহে মিলনমুহূর্তে

কীর্তনপার্ষদগণ বিদ্যাপতি ঠাকুরের সময়োপযোগী ভাবসম্মিলনের একটি পদ গেয়েছিলেন, যার আরম্ভ,

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"

ষড়্গোস্বামীর অভীষ্টপূরক অশেষশাস্ত্রপারঙ্গম সুপ্রবীণ সত্যসন্ধ চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্ট ভাষায় এই মিলনোৎসবের এবং সেই সঙ্গে বিদ্যাপতির এই পদগানের বিবৃতি দিয়েছেন। বিদ্যাপতির এই বহু-কীর্তিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পদেরই অন্তর্গত একটি কলি "শীতের ওঢ়নি পিয়া গিরিষির বা" ইত্যাদি"। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন আমার কথাটি মেনে নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে অবশ্য তিনি পরে প্রচুর অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছিলেন। আমরা যদি কেউ বলি, 'অতিবৃদ্ধ অন্ধ জরাতুর' কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি বলতে কি বলেছিলেন, ঠিক যে বিদ্যাপতির পদই সেদিন গাওয়া হয়েছিল তা না-ও হতে পারে, তা হলে বলতে হয়, একটি পাষাণ-প্রাকারে মাথা ঠুকলে প্রাচীরটি উড়ে যাবে, আমাদের মাথা যা ছিল তাই থাকবে। মনে রাখতে হবে, ভজনপ্রবীণ চিরকুমার চরিতকারের সম্মুখে চরিতামৃতের শ্রোতারূপে ভক্তিস্তিমিত নেত্রে উপবিষ্ট থাকতেন ভক্তিজগতের যে সমস্ত দিক্‌পাল তাঁরা হলেন,

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

যাঁদের একজন ব্যতীত অপর সকলেই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, এবং যাঁরা তথ্যবিচ্যুতি নিশ্চয়ই মার্জনা করতেন না।

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে ও পরে বহুভাষাবিৎ সাহিত্যরসিক ও ভারত তত্ত্ববেত্তা সুধী ব্যক্তিরা অনেকেই বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পর্কে অনুরূপ সংশয় প্রকাশ করেছেন। স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন, জগদ্বন্ধু ভদ্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা এঁদের মধ্যে প্রধান। আমাদের কালে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ডাঃ সুকুমার সেন এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার ও আলোচনা করে তাঁর সুচিন্তিত ও মূল্যবান্ মতামত আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এঁদের পথরেখা ধরে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন আমাদের অশেষ স্নেহভাজন কৃতী ও উৎসাহী গবেষক, তরুণ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমান্ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, এম.এ., ডি.ফিল.। বিদ্যাপতি-বিষয়ক গবেষণায় তাঁর সারস্বত অধ্যবসায়ের ঐকান্তিকতা ও বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় আমি জেনেছি ও শিখেছি প্রচুর। এই 'সমীক্ষা' যাঁদের প্রেরণায় এবং

আশীর্বাদে সার্থক হয়ে উঠেছে, শ্রীমান্ নিরঞ্জনের এমন দুই গুরু আজ পরলোকে। তাঁরা বহুশ্রুত স্বনাম খ্যাত অধ্যাপক ৺ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও ৺ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার। শ্রীমানের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী শিক্ষা-গুরু ও উপদেষ্টা দেশবরেণ্য সুধী অধ্যাপক বন্ধুবর ডাঃ সুকুমার সেন দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত সহস্রাধিক পদ গৌড়বঙ্গে, মিথিলায় ও নেপালে নানা পুঁথিতে ও গায়কপরম্পরায় মুখে মুখে সংরক্ষিত ও সংগৃহীত হয়ে এসেছে পাঁচশো বছর ধরে। এখনও হয়ত কিছু পদ অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে। ডাঃ চক্রবর্তীও তাঁর বর্তমান সমীক্ষায় সতরটি নতুন পদ প্রকাশিত করেছেন। আদৌ বিদ্যাপতির রচিত নয়, অথবা সামগ্রিকভাবে বিদ্যাপতির রচিত নয়, এমন বহু পদ অর্দ্ধসহস্র বৎসরের পুঞ্জিত ঐ পদসম্ভারে স্থান পেয়ে গিয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রসকল্পবল্লী, রসমঞ্জরী, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, সংকীর্তনামৃত, পদামৃতসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, স কীর্তনানন্দ, পদকল্পতরু, পদরসসার, পদরত্নাকর, রসকলিকা, রসনির্যাস প্রভৃতি প্রাচীন পদসংগ্রহে এব পদ-রত্নাকর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্কলিত), অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, গৌরপদতরঙ্গিণী, কীর্তনগীতরত্নাবলী, পদামৃত মাধুরী, কীর্তনপদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স০কলন, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সংকলন প্রভৃতি আধুনিক সংকলনগ্রন্থে বিদ্যাপতির পদাবলী যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ সংকলনের আয়তন অনুসারে বিদ্যাপতির পদাবলীর সংখ্যার তারতম্য ঘটেছে। আবার সংগ্রহে সংগ্রহে পদাবলীর পাঠে বিভ্রান্তিকর গুরুতর বৈষম্য দেখা দিয়েছে। সুধী সংগ্রাহক ও গবেষকেরা বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ পদের পাঠ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের পথ ধরে অনেক সময়ে পূর্বসূরীদের সঙ্গে ভিন্নমত হয়েছেন। তাঁদের যুক্তিপরম্পরা সতর্কতা সহকারে অনুসরণ করলে দেখা যায়, এই বিষয়ে সকলে নিজ নিজ রুচি ও বিশ্বাসের অনুবর্তন করেছেন। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" কথাটি কত উদার ও বাস্তবভিত্তিক এই প্রসঙ্গে তা বোঝা যায়। বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ ও পদসমীক্ষার গবেষণামূলক কাজ এইভাবে এগিয়ে চলেছে ও চলবে। তার মূল্য প্রচুর, গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিদ্যাপতি-সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের যে কথাগুলি মনে হয়েছে, শ্রীমান্ নিরঞ্জনের গ্রন্থপরিচায়িকায় সেই কথাগুলি বিদ্যাপতির বিদগ্ধ পাঠক ও গবেষকমণ্ডলীর কাছে অকপটে নিবেদন করি।

বিদ্যাপতি-নামধেয় (উপাধিধারী নয়) বিদগ্ধ স্মার্ত মৈথিল রাজকবির রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক পদাবলী মহাপ্রভুর পূর্ব হতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের মাধ্যমে বাংলা ও মিথিলা, প্রাচ্যভারতের এই দুই সন্নিহিত ভূভাগের যোগাযোগ

তার অন্যতম কারণ হতে পারে। মহাপ্রভুর আস্বাদনের কষ্টিপাথরে বিদ্যাপতির পদাবলীর রসোৎকর্ষ পরীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর পূর্বে ও প্রকটকালে বিদগ্ধ রসিকসমাজে ও ভক্তপরিমণ্ডলে তাঁর পদাবলী শুধু পঠিত নয়, কীর্তিতও হত। অদ্বৈত-ভবনে চৈতন্য-চরিতামৃত-কথিত ভাবসম্মিলনের পদগানের সুস্পষ্ট উল্লেখ তার একটি অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। অদ্বৈতাচার্য প্রথম যৌবনে পাঠসমাপনান্তে মিথিলাভ্রমণে গিয়ে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারলাভ ও সুকণ্ঠ সুপুরুষ বয়োভারনত রাজকবির কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত পদাবলী-গান শুনে এসেছিলেন, অদ্বৈতপ্রকাশের এই সাক্ষ্যগ্রহণে এ-কালের গবেষকের আপত্তি থাকতে পারে, একথা আমরা জানি। কিন্তু সে-সঙ্গে একথাও জানা যায় যে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহের নানা দশায় স্বরূপদামোদর ও অন্যান্য ভক্তপরিকর প্রভুর 'ভাবের উচিত পদ' গান করে তাঁর আর্তি-প্রশমনের প্রয়াস পেতেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, চরিতামৃতের

> "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
> কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
> স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
> গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"—

এই বিবৃতিতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত ও রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক-গীতির উল্লেখ থাকলেও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কোনও সমগ্র গ্রন্থের নামের পরিবর্তে মহাজনরূপে শুধু তাঁদেরই নামোল্লেখ রয়েছে। মহাজন-পদকর্তা হিসাবে তাঁদের পদাবলীর বহুল প্রচলনের সাক্ষ্য হিসাবে এই উক্তি গ্রহণ করা যায় না কি? গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্বম্ভর নিমাই পণ্ডিত সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তি দর্শন করে যখন পুঁথিতে ডোর দিলেন, তাঁর ভক্ত পড়ুয়ার দল যখন পাঠব্যাখ্যানের ব্যপদেশে কৃষ্ণনামগুণ শ্রবণ করে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়লেন, তখন শ্রীবাস-অঙ্গনে স্বানুভব-সম্পন্ন মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ ভক্তপরিকর-গোষ্ঠী নিয়ে কীর্তন-নামক সাঙ্গীতিক শিশু সংস্থাটি মহাপ্রভু গড়ে তুলেছিলেন। এইজন্য বলা হয়েছে, "সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। তাই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ "সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ" বলে বন্দিত হয়েছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনের এই রহঃ-কীর্তনে তৎকাল-প্রচলিত সুললিত মহাজন পদাবলী গান করা হত, একথা মনে করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।" এই নামাক্ষর অথবা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এই ষোড়শাক্ষর অবশ্য হাতে তালি দিয়ে গান করা হত। কিন্তু কীর্তনোৎপত্তির কাল অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথম দশক থেকে

আরম্ভ করে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খেতুরির উৎসবে কীর্তন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত এত দীর্ঘকাল ধরে শুধু নামাক্ষরই কীর্তিত হত, অজস্র রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচিত হলেও পদকীর্তন তখন প্রচলিত ছিল না, এরূপ অভিমত কোন-কোন সুধী ব্যক্তি পোষণ করলেও আমাদের প্রতীতিগম্য হয় না।

পরবর্তী কালে স্বয়ং-পদকর্তা বৈষ্ণব পদসংকলনকারেরা মহাজন-পদাবলী সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন কেবলমাত্র সাহিত্যিক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে নয়। বৈষ্ণব পদাবলী সুরধুনীর মতো ত্রিপথগা। এর রচনা ও সংকলনের প্রেরণা আমাদের মতে ত্রিবিধ, সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক ও আধ্যাত্মিক। ভাগবত-প্রোক্ত ভক্তিলাভের উপায় নবধা,

"শ্রবণং কীতনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অচনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্॥"

সুমধুর ব্রজবুলির ঝংকার দিয়ে গোবিন্দদাস প্রার্থনার পদে এর প্রতিধ্বনি তুলেছেন,

"শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥'

এখানে আমরা পাই রাগানুগা ভক্তির সাধন হিসাবে একটি সুনির্দিষ্ট মনস্তত্ত্ব-সম্মত সাধন পর্যায়। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন ইত্যাদি তার বিভিন্ন স্তর। এই স্তরগুলি অতিক্রম করে "প্রেমা পুমর্থো মহান্" লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এইভাবে বৈষ্ণব যুগেই বৈষ্ণব পদাবলী-সংগ্রহেব কাজ আরব্ধ হযেছিল। একালের মতো কোনও সাহিত্যিক আন্দোলন বা ঐতিহাসিক প্রবর্তনার প্রয়োজন হয়নি। বৈষ্ণব যুগে সঙ্কলিত প্রত্যেকটি পদসংগ্রহে শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাজন পদকতা বিদ্যাপতির পদাবলী সমাহৃত হযেছে, যদিও কোন-কোন সংগ্রহে চণ্ডীদাসের পদাবলী একেবারেই বাদ পড়ে গিযেছে। (অবশ্য এই অভাবের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আস্বাদিত পদকর্তা চণ্ডীদাসের অপ্রামাণিকতা বা অর্বাচীনত্বেব সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাইনি।) বাংলাদেশের সুবৃহৎ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের গঠনে, ভাবে-ভাষায়, রাগে-ব্যঞ্জনায়, অলঙ্কারে ধ্বনিমাধুর্যে বিদ্যাপতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়েছে, তার মূলে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে বিদ্যাপতিঠাকুরের পদাবলীর এই সাঙ্গীতিক সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যের প্রেমাতিময় দিব্য-জীবনের প্রতিফলন, তেমন অন্যদিকে মৈথিল বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর রসসুনিবিড

কাব্যগীতিময় প্রতিধ্বনি। আমাদের পদাবলী-সম্পদের যুগল উৎস, অন্তরঙ্গে এক দেবমানবের দিব্যজীবন এবং বহিরঙ্গে এক রাজকবির পদগীতিকা। একজনের "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্", আর একজনের জন্ম ও কবিকর্ম মিথিলায়। "জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিল দেশে করু বাস।" বিদ্যাপতি-নামধেয় কোনও কবি গৌড়বঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন একথা এখনও প্রমাণিত হয়নি। "ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি", অথবা "দ্বিতীয় বিদ্যাপতি" (নামে বিদ্যাপতি নন) বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিলেন, একথা সত্য। তাতে মৈথিল বিদ্যাপতির গৌড়বঙ্গে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাই প্রমাণিত হয়, যেমন বিদ্যাপতির অভিনব-জয়দেব আখ্যা জয়দেবের নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠাই প্রতিপন্ন করে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রবক্তা পদকর্তা গোবিন্দদাসের সম্পর্কে বৈষ্ণব পদকর্তা বলেছেন,

"ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
রচিলেন কবি-বিদ্যাপতি।
গোবিন্দের কবিত্বগুণ তাহা হৈতে নহে ন্যূন,
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥"

গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভাসম্বন্ধে এই প্রশংসোক্তি গৌড়বঙ্গে বিদ্যাপতির সুমহতী প্রতিষ্ঠাই প্রমাণিত করে। বিদ্যাপতির দৈন্যবিনয়-মণ্ডিত এবং কঠোর আত্মবিশ্লেষণমূলক প্রার্থনার পদ প্রাণস্পর্শী, বৈষ্ণবপ্রাণতার মর্মমূল হতে উৎসারিত। মাথুর-বিরহে বিদ্যাপতি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর হৃদয়দ্রাবী মাথুরের পদ ছাড়া মাথুর-কীর্তন জমে না। ভাব-সম্মিলনে তিনি অনতিক্রান্ত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তার গুণে বিদ্যাপতির পদাবলী গৌড়বঙ্গে বহুল পরিমাণে অনুকৃত বিবৃত ও বিকৃত হয়েছে। অনেকগুলি উপাধি বিদ্যাপতির নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল—কবিরঞ্জন, কবিবল্লভ, কবিশেখর, প্রভৃতি। পরে তদুপাধিক বা তন্নামক কোন-কোন কবির পদ মৈথিল বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে ভণিতা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মিশে গিয়েছে। কীর্তনিয়া ও পুঁথিলেখকদের বিতর্কহীন ঐতিহাসিকচেতনা-বিমুখ সংস্কার এর জন্যে দায়ী, কোনও অসাধুতা বা সাম্প্রদায়িক অথবা সাংগঠনিক আন্দোলন বোধ হয় নয়। আমাদের মনে হয় না, খ্যাত অখ্যাত কবিরা ব্যাপকভাবে নিজ নিজ রচনা বিদ্যাপতির ভণিতার তরণীতে তুলে দিয়ে কালের স্রোতে অন্তর্ধান করেছেন। আমাদের কালের পণ্ডিতেরা ও সুধী গবেষক-পরম্পরা ভাষাতত্ত্বের ও ভণিতাবিচারের নিরিখে বিদ্যাপতির বহু পদই বিদ্যাপতির বলে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে নিজ নিজ বিশ্বাস যুক্তি ও রুচি অনুসারে দুশ্ছেদ্য সমস্যাজাল

বয়ন করে চলেছেন, যার ফলে অনেক উৎকৃষ্ট পদ বিদ্যাপতির রচনা হতে খারিজ হয়ে গিয়েছে।

পদাবলী সম্পর্কে একটি কথা অনেক দিন ধরে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। কথাটি এখানে বলা আবশ্যক। সুশিক্ষিত নিষ্ঠাবান্ কীর্তনিয়ার কীর্তনগান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, কোনও কীর্তনিয়াই একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার একটি সমগ্র পদ একটানা কীর্তন করেন না। পদের প্রথম কলি এবং ভণিতাংশ নিয়ে পালা সাজিয়ে অনেক সময়ে আখর, অথবা অন্য অজ্ঞাতমূলক পদের অংশ যোজনা করে কীর্তনগান করেন। আর একটি কথা প্রায়শঃ সত্য, শ্রেষ্ঠ কবি অথবা পদকর্তা তাঁর একটি রসসুনিবিড় রচনায় প্রথম অথবা অন্য কোন কলিতে ভাবরসের একটি তুঙ্গস্থানে আরোহণ করেন, সাধারণতঃ পদের সেই তুঙ্গস্থান অথবা ভাবশীর্ষে তিনি অনুক্ষণ অবস্থান করেন না। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'Emotion recollected in tranquillity' বোধ হয় এই আরোহ-অবরোহের ইঙ্গিত বহন করে। পদের অবশিষ্ট অংশে দেখা যায় সেই ভাবের বিবৃতি, অনেকটা অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের ভঙ্গিতে রচিত। কবিপ্রাণ মর্মগ্রাহী কীর্তনিয়ারা তাই উৎকৃষ্ট পদের স্বনির্বাচিত অংশ কীর্তনে পরিবেশন করেন। স্বল্পপ্রতিভাসম্পন্ন কীর্তনিয়ারা এই গ্রহণ-বজনের ব্যাপারে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে বসেন। ফলে শঙ্কর পদাবলীর সৃষ্টি হয়। মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস'-শীর্ষক চতুর্দশপদীর ভাষায় বলতে গেলে, যে সিদ্ধিপ্রদ দেবতা "আদি ব্রহ্ম বেদের বচনে" তিনি "করি-শিরঃ" হয়ে বসেন। ভাষা-অলঙ্কার, ভাবরস সকল ক্ষেত্রেই এর ফলে যে অবিশ্বাস্য অশোভন শাঙ্কর্যের সৃষ্টি হয়, সেকালের পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল কীর্তনিয়ারা ও সরল জীবিকান্বেষী পুঁথি নকলকারীরা সে-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। শ্রীমান্ নিরঞ্জন বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এমন অদ্ভুত একটি শঙ্কর-পদ বরাহনগর পাঠ-বাড়ীতে রক্ষিত ২২নং পুঁথি হতে তাঁর সমীক্ষায় উদ্ধার করেছেন। পদটি এই,

"সাযরে মরিব সখি করিয়া কণ্ডলী।
কানুরে কহিয় যেন দেন তিলাঞ্জলী॥
সেই আপন কান হোয়ব যব রাধা।
তবয়া জানব বিরহক বাধা॥
শ্যাম ত্যজিয়া গৌর যব হোয়ব কান।
গৌর শ্যাম যব হো এক ভাণ॥

বিরহক যত দুখ জানব কাজ।
যত দুখ এ সুখ হৃদয়ক মাঝ ॥
লছিমাক দুখ নৃপতি কি জান।
বিদ্যাপতি কবি দুখ পরমাণ ॥”

এখানে পদের ভণিতাই শুধু বিদ্যাপতির, ভাষা ও ভাববস্তু নিশ্চয়ই তাঁর নয়। পদের অর্বাচীনত্ব ও অপ্রামাণিকতার প্রমাণ পদের অধোরেখ অংশ। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্বের অভিন্নতা অতি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সহজিয়া-গুরুমহাশয়েরা বোধ হয়, পদের ভণিতায় লছিমা-বিদ্যাপতিকে যুক্ত করে পদের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে হিতে বিপরীত ঘটিয়ে বসেছেন। কিন্তু এমন শার্ক্ষ্য-দোষাশ্রিত পদেও কখন কখন বিদ্যাপতির রচনার ছিঁটা-ফোটা অলক্ষ্যে থেকে যায়, যা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি পদ মনে পড়ে “সখি কি পুছসি অনুভব মোয।” পদটি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ভাবসম্মিলনের এই সুপ্রসিদ্ধ পদটি বহুকাল ধরে বহুজন বিদ্যাপতির রচনা বলে মনে করে এসেছেন। সুধী সমালোচকের ভোটে সম্প্রতি পদটি বাতিল হয়ে গেছে। এই পদটি কবি-বল্লভ-উপাধিক অথবা বল্লভ-নামধেয় পদকর্তার রচনা বলে সাব্যস্ত হয়েছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অনেক প্রথম শ্রেণীর পদে কতকগুলি প্রয়োগসাদৃশ্য বা বিশেষ বাচনভঙ্গীর প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত লক্ষ্য করার বিষয়। ‘অনুভব’ বা ‘আনুভব’ তেমন একটি প্রয়োগ। চণ্ডীদাসে ‘মরম’ ‘পীরিতি’ প্রভৃতি স্বরভক্তি-সৃষ্ট প্রয়োগের বাহুল্য দেখা যায় (অবশ্য ‘পিরীতি’ শব্দটিতে সহজিয়ারা বহু ব্যবহারের ছাপ দিয়েছেন)। ‘অনুভব’ শব্দটি ভাগবত-প্রোক্ত এবং স্মার্তধর্মে আভাসিত ‘হৃদয়েনাভ্যানুজ্ঞাতঃ’ সংজ্ঞাটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

“কত বিদগধ জন রস-অনুমগন
আনুভব কাহু ন পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥”

এখানে ‘আনুভব’ ভাগবতের ‘স্বানুভব’ প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে মনে করা যেতে পারে। এমন অনেক শব্দচিত্র, ভাবানুষঙ্গ ও অলঙ্কারপ্রয়োগ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের যুগের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। ভাবসম্মিলনের একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ (মালারূপকের প্রকৃষ্ট উদাহরণযুক্ত) এই,

"হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
হৃদযক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
... . "

চণ্ডীদাসের একটি উৎকৃষ্ট পদে পাই (পদটি রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের বহু প্রশংসিত)

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এ হেন প্রেম কভু না দেখিয়ে॥

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে জলোদ্ধৃত মীনের উপমাটি পাওয়া যায়। ভাবানুষঙ্গ ও ভাষাব্যবহারের এই ঐক্য যুগসামীপ্যের সূচনা করে।

উপসংহারে একথা বলা যায়, এই প্রসঙ্গের প্রারম্ভে কথিত অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংশয়টি নানা আকারে ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ও রসজ্ঞ পাঠকের চিত্ত আন্দোলিত করে এসেছে। শুধু ভণিতাবিচার ও ভাষাতত্ত্ব-বিশ্লেষণের পথে হয়ত সংশয়ের নিরসন হবে না। বিদগ্ধ পাঠককে পদাবলী সাহিত্যের উপরিচর না হয়ে তলাবগাহী হতে হবে। বর্তমান গ্রন্থকার ডাঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর এই প্রশংসনীয় সারস্বত প্রয়াসে বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্বন্ধে পূর্ণসত্য প্রকটন করতে না পারলেও পদাবলীর ভাববস্তু ও রসবিচার করে অনেকস্থলে সংসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা'র একটি মুক্তার মতো নিটোল কবিতায় বলেছেন,

"রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম,
ভক্তেরা লোটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

নীলাম্বুধির তীরে একদিন নীলাদ্রিনাথের রথযাত্রায় হয়ত বিদ্যাপতির সুমধুর পদাবলী গীত হয়েছিল। নীলাদ্রিনাথও সে গীতাঞ্জলি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর নিজস্ব রূপ সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য সেই দেবতার মতো আজও অলক্ষিত রয়ে গেছে। ভক্ত-গবেষক শ্রীমান্ নিরঞ্জন সুধী-সংসদে সাধু-সংসর্গে পথে লুটিয়ে প্রণাম করেছেন। তাতেও অন্তর্যামী হেসেছেন। দেবতার প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত নিষ্ঠাপূত এই সারস্বত অধ্যবসায়ের ফল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' সুধীজনের হাতে তুলে দিয়ে আমার অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর পরিচায়িকার উপসংহার করি।

শ্রীজনার্দন চক্রবর্ত্তী

নিবেদন

বিদ্যাপতি-সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান বর্তমান গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। অনেকে এই সমস্যাকে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা বলে মনে করেন। তৎকালীন পূর্বভারতের কবিসম্রাট ছিলেন মিথিলার বিদ্যাপতি। তাঁর গ্রন্থাদি এবং বহু পদ বাংলা দেশের বাইরের রসিকসমাজ কর্তৃক উপযুক্ত মর্যাদায় রক্ষিত হয়েছে কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠপদসমূহ রক্ষিত হয়নি। যদিও তাঁরা শুধুমাত্র বিদ্যাপতির এই শ্রেষ্ঠ পদগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল রচনাকারের (বিদ্যাপতিরও) তথা ভাবতীয় ভক্তি সাহিত্যের অর্ঘকে সযত্নে অন্তরের সামগ্রী করে রেখেছেন। যুক্তির দরবারে বাংলা দেশের প্রতি এই গৌরব-আরোপের চেষ্টা অগৌরবেরই। যা সত্য তা কঠোর হলেও তাকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই। পূর্বভারতের এই কবিসম্রাটের পদসমূহ সেকালের জনচিত্ত হরণ করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে পদগুলি একান্তভাবেই মৈথিলী। এই পদগুলিও অল্প মূল্যের নয়। মৈথিল বিদ্যাপতির পদামৃত পান করেছেন বহু কবিচিত্ত। তাঁরাই বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করেছেন এবং সেগুলি বিদ্যাপতির নামের তরণীতে তুলে দিয়েছেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হয়। যাঁরা চণ্ডীদাসেব অবিসম্বাদিত্বে অনুরাগী তাঁদেব একথা মনঃপূত হবে না। কিন্তু প্রায় অখ্যাত দীনবন্ধুদাসেব নিজস্ব সংকলন গ্রন্থে যখন চণ্ডীদাসেব বহুখ্যাত 'বন্ধু কি আর বলিব তোরে' পদটি দীনবন্ধুরই ভণিতায পাই কিংবা 'রসকলিকাকার' নটবরদাসের আপন সংকলন গ্রন্থে তাঁরই ভণিতায চণ্ডীদাসেব 'ঘরেব বাহিরে দণ্ডে শতবার' পদটি মেলে, তখন চণ্ডীদাসের এই বহুখ্যাত পদগুলিকে চণ্ডীদাসের বলা যায না। চণ্ডীদাসের নামে আরোপিত শ্রেষ্ঠ পদ যদি অখ্যাত পদকর্তার হয়, তবে চণ্ডীদাসের ভক্তদের মনোকষ্টের কারণ হয সত্য কিন্তু সত্য-নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করা যাবে না। মৈথিল বিদ্যাপতি, সহজিয়া ভাবাশ্রয়ী পদ বা নিছক বাংলাতে পদ রচনা করতেন, একথা বোধ করি কেউ বলবেন না। কাবণ, ঐতিহাসিক বিচারে তা গোপন করা যাবে না এবং বিদ্যাপতি-সমস্যার যথার্থতা-স্বীকার সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, অপ্রকাশিত 'কীর্তনানন্দ' গ্রন্থে কবিবল্লভ ভণিতায় যে পদগুলি গৃহীত হয়েছে, তার সঙ্গে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র হরিবল্লভের ভণিতাযুক্ত পদ মেলে। হরিবল্লভ তথা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কবিবল্লভ নামে যে উল্লিখিত হতেন, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিদ্যাপতির পদ-রীতির সার্থক অনুসারী তা অস্বীকার করা যায় না।

যাই হোক, এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান নিবন্ধটি রচিত হয়েছে। আচার্য শশিভূষণের তত্ত্বাবধানে আমার কাজ সুরু হয়েছিল এবং তাঁর লোকান্তরণের পর পরিসমাপ্ত হয়েছে আচার্য জনার্দন চক্রবর্তী মহোদয়ের কাছে। আচার্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য ছাত্রের প্রতি তাঁর অনন্যসাধারণ সস্নেহ-উদারতা এবং অপার-সহিষ্ণুতার প্রতীক। বিদ্যাপতিচর্চার ইতিহাসে তাঁর ভক্তিচন্দনচর্চিত পূত বিশ্বাসের মর্মবাণী 'পরিচারিকা'রূপে এই গ্রন্থের শিরোভূষণরূপে প্রকাশিত হ'ল। তাঁর প্রতি আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করছি। তাঁর স্নেহ-দাক্ষিণ্য আমার অশেষ সৌভাগ্য।

বর্তমান নিবন্ধের অপর দুইজন পরীক্ষক ছিলেন আচার্য বিমানবিহারী মজুমদার এবং আচার্য সুকুমার সেন। বিদ্যাপতিচর্চায় উভয়েই শ্রুত-কীর্তি পূর্বসূরী। আচার্য বিমানবিহারী কয়েকটি পত্রে এই গ্রন্থের দ্রুত প্রকাশের জন্য আদেশ করেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য তাঁর জীবনকালের মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল না। এই গ্রন্থের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর মতৈক্যের কথা জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, গ্রন্থ প্রকাশের পর এই গ্রন্থ সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর পরিবর্তিত মত তিনি লিখবেন। এ সৌভাগ্য থেকে আমরা চিরকাল বঞ্চিত রইলাম। তাঁর পুণ্য নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করে আমি নিজেকে কৃতার্থবোধ করছি।

আচার্য সুকুমার সেনের সস্নেহ-নির্দেশ আমার মূল্যবান পাথেয় হয়ে রয়েছে। তাঁরই নির্দেশে 'অপ্রকাশিত পদগুচ্ছের প্রথম ছত্রের সূচী' পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীমান অশোককুমার বারিকের তৎপরতা সানন্দে স্মরণ করছি। শ্রীমান অশোকের প্রতি আমার প্রাণভরা সস্নেহ শুভ কামনা জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরাহনগর পাঠবাড়ীর কর্তৃপক্ষের নিকট এবং ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা লেখককে সপ্রীতি সাহায্য দান করেছেন, তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতা স্বীকারে পরিশোধ করবার স্পর্ধা আমার নেই। এই উল্লেখ শুধু লেখকের অকৃত্রিম অনুভবের যথার্থ অভিজ্ঞান মাত্র।

দেশবন্ধু কলেজ
(দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
নতুন দিল্লী-১৯

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-কথন

এক

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের পুঁথিশালাগুলিতে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া আমি বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদ অনুসন্ধান করিতেছিলাম। গ্রীয়ার্সন সাহেব ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৮২টি পদ মিথিলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র "মহাজন পদাবলী" গ্রন্থে এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সারদাচরণ মিত্র বিদ্যাপতির পদ সংকলন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি-চর্চায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতে লাগিল (এ সম্পর্কে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে)। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় সম্পাদিত "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী"তে বিভিন্ন পর্যায়ে ৯৩৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদনায় বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা বিভিন্ন পর্যায়ে ৯৩৩টি। এই সংস্করণের পূর্বে প্রকাশিত বহু পদ অ-বিদ্যাপতির বলিয়া বাতিল করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনবোধে নূতন পদ সংযোজিত হইয়াছে। প্রায় ৯০ বৎসর ধরিয়া সুপণ্ডিত এবং মহামতি গবেষকগণ বিদ্যাপতির পদ অনুসন্ধান এবং বিচার করিয়াছেন সত্য, তথাপি বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত পদ যে আজও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে এবং এই পদ-সমুদ্রের বিচারে নূতন আলোকপাত করা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহের চেষ্টাও ইতিপূর্বে হইয়াছে। বিহার সরকার হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য দিয়া (কুমার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যখন বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন) রাষ্ট্রভাষা পরিষদের পক্ষ হইতে কয়েকজন সুপণ্ডিত গবেষককে বাংলা দেশে বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত নূতন পদ সংগ্রহের জন্য পাঠানো হইয়াছিল। বাংলা দেশের প্রায় সকল পুঁথিশালাগুলিতে

তাঁহারা অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রাচীন বাংলা হস্তাক্ষরের সহিত পরিচিত না থাকায়, তাঁহারা নূতন কোন পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গিয়া ৭১টি নূতন পদ আমার সংগ্রহভুক্ত হইল।

আমার সংগৃহীত নূতন পদগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে আমার মনে হয় যে, এই পদগুলির রচয়িতা মিথিলার মহাকবি বিদ্যাপতি কিছুতেই হইতে পারেন না। আমার সংগৃহীত পদগুলি পরলোকগত আচার্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয়কে দেখাই এবং আমার অনুমানের কথাও জানাই। তিনি আমাকে এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিবার জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবনকালের মধ্যে আমার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হইল না এবং এই কার্যের পরিণত রূপ তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত পরম ভাগবত আচার্য জনার্দন চক্রবর্তী মহোদয়ের পরামর্শানুযায়ী আমার কার্য অবশেষে সমাপ্ত হইল। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।

দুই

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব তাঁহার "Modern Literary History of Hindusthan" গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"Number of imitators sprang up, many of whom wrote in Vidyapati's name, so that it is now difficult to separate the genuine from the imitations, especially as the former have been altered in the course of ages to suit the Bengali idiom and metre."

ইহার পরবর্তী গবেষণায় বাংলা দেশে যে একজন বিদ্যাপতি ছিলেন, যাঁহাকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হইত, তাহা গৌরগুণানন্দ ঠাকুর "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" গ্রন্থে (১৯১০ খ্রীঃ) উল্লেখ করেন। ইহার পর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীখণ্ডের এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি সম্পর্কে 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৩৬, ইং ১৯২৯) এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩৮।৩, ইং ১৯৩১) দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পদ-সংকলন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" (১৩৫৯, ইং ১৯৫৩) গ্রন্থে 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ' স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয় এবং সাম্প্রতিক কালে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বৈষ্ণব পদাবলী" (১৩৬৮, ইং ১৯৬১) গ্রন্থেও বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদের স্বতন্ত্র সংগ্রহ নির্দেশ করা হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে গ্রীয়ার্সন সাহেবের উক্তিকে নির্ভর করিয়া বিদ্যাপতির সমগ্র পদসাহিত্যে বাঙ্গালী কবি-সমাজের অবদান কতখানি, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বলিলে শুধুমাত্র কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিকে নির্দেশ করা চলে কি না এবং যদি তাহা না হয়, তবে বিদ্যাপতির পদে কোন্ কোন্ কবির রচনা যুক্ত হইয়াছে অথবা বাংলা দেশের কবি-প্রকৃতি বিদ্যাপতিকে কিভাবে নব রূপে সৃষ্টি করিয়াছে এবং বাংলায় বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদাবলীর বৈশিষ্ট্যই বা কি, তাহা আলোচিত হইয়াছে। নেপাল, রামভদ্রপুর, তরৌনীর পুঁথির পাঠের প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির পাঠের ভিন্নতা কতখানি, তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, বাংলা দেশের প্রাচীন সংকলন-গ্রন্থের পাঠেরও বিচার করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলীর কৃত্রিমতা এবং অকৃত্রিমতা সম্পর্কে পুনর্বিচার করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত, বিদ্যাপতির পদাবলীর বিচারে ভণিতাংশের আলোচনা ও বিচারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা দেখানো হইয়াছে। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত সহজিয়া পদগুলির বিচার এবং বিদ্যাপতির পদ-সমীক্ষায় বাঙ্গালী কবির অখণ্ডনীয় অস্তিত্বের পূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের পর সমগ্র নিবন্ধটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া আলোচনার পারম্পর্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বিদ্যাপতি বিষয়ক আলোচনার ইতিবৃত্ত' বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদের সম্ভাব্য রচয়িতাগণ' প্রসঙ্গে কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ছাড়াও, চম্পতি, ভূপতি, নৃপতি নামযুক্ত বিদ্যাপতির পদ

আলোচনা করিয়া তাঁহাদের উপর বিদ্যাপতির কতটুকু দাবি আছে এবং বাংলা দেশে বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদ-বিচারে এই কবিগণের আলোচনা কতখানি অপরিহার্য, তাহা বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদসমূহের ভাব-বিচারে 'সহজিয়া বিদ্যাপতির পদ' সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বিদ্যাপতির পদসমূহ কিভাবে বাংলাতে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা প্রচুর দৃষ্টান্তসহযোগে দেখানো হইয়াছে। এই রূপান্তর শুধু বাংলা দেশেই কিভাবে ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিদ্যাপতির প্রাচীন পাঠসমূহেও এই রূপান্তরের প্রকৃতি-নির্দেশ করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদে'র বিচার করিয়া বিদ্যাপতির পদে বাঙ্গালী কবি-সমাজের অবদান কতখানি, তাহার পরিচয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদাবলীর পটভূমিকায় এই বিদ্যাপতি-সমীক্ষা বস্তুতঃ বিদ্যাপতির পদাবলীতে বাঙ্গালী কবি-সমাজের অস্তিত্বের বিশ্লেষণ মাত্র। বিদ্যাপতির পদাবলী আশ্রয় করিয়াই এই কবি-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহারা একেবারে আশ্রিতের ভূমিকায় না থাকিয়া স্বতন্ত্র গৌরবে বিদ্যাপতিকে মহনীয় ও আদরণীয় করিয়া নব রূপ দান করিয়াছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

> "বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিলে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলীগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদের থাকিবেন। আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি দাঁড় করাইয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে।"

একান্তভাবে বাংলা দেশেরই বিদ্যাপতির নবরূপের স্বরূপ-বিচারই এই নিবন্ধের মর্মকথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যাপতি বিষয়ক আলোচনার ইতিবৃত্ত

এক

"মাধুর্য প্রসবস্থলী গুরুযশোবিস্তারশিক্ষাসখী
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী ॥"

'কীর্তিলতা'-কার তরুণকবি বিদ্যাপতি মাধুর্যের প্রসবস্থলী-স্বরূপ যশো-বিস্তারের শিক্ষা-সখী-সদৃশ তাঁহার কবিতাবলী সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইবার কামনা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণা তরুণসুলভ দম্ভোক্তিতেই পর্যবসিত হইত যদি কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মৈথিলী পদগুলি আবিষ্কৃত না হইত। ঐতিহাসিকের যুক্তি ও তথ্যের দাবীতে বিদ্যাপতি মিথিলার কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু, বাঙ্গালী বৈষ্ণব রসিক সাধকগণ বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতে করিতে তাহাতে এমন ভাব সংযোজন করিয়াছেন, যাহার ফলে কেবলমাত্র বাংলা দেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদগুলিকে (বহুলাংশেই) বাঙ্গালী কবিগণেরই রচনা বলিয়া মনে হয়। নেপালের পুঁথিতে বা রামভদ্র-পুরের পুঁথিতে বিদ্যাপতির যে সব পদ পাওয়া যায় তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিরিখে বিচার করিলে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভাষাকে অতিক্রম করিয়া ভাব বড় একটা আত্ম-প্রকাশ করে নাই। ভাবের মূর্ছনায় ও ঝঙ্কারে এবং কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় এই পদগুলির সহিত অন্যান্য আকর হইতে প্রাপ্ত পদের পার্থক্য প্রচুর। পরবর্তী আলোচনায় তাহা দৃষ্টান্তসহ দেখানো হইবে। যাহা হউক, বাংলা দেশের রসিক জনচিত্ত বিদ্যাপতিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আপন মনোরাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া ভালবাসার ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন এবং আজও আসিতেছেন। ফলে, বিদ্যাপতি মিথিলার হইয়াও একান্তপক্ষে বাঙ্গালীরই কবি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত বিদ্যাপতিকে যাঁহারা ধর্ম

এবং জীবনের ভূমিতে স্থাপন করিয়া তাঁহার কবিখ্যাতিকে অমলিন সৌন্দর্য-ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা বাংলা দেশেরই জনসমাজ। বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণব মরমীয়া সাধকগণ সকলেই বিদ্যাপতির পদাবলীর মাধুর্যধারায় আপনাদের পরম পবিত্রস্তান করিয়াছেন। মৈথিল শব্দ বাঙ্গালী তাহার নিজের মতো করিয়া পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। এই পরিবর্তনে পদের বিশুদ্ধি হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু তাহার পূত মহিমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভালবাসার পবিত্রতায় পরিবর্তন-জাত মালিন্য সহজেই ক্ষমার্হ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশের রসিক জনচিত্তে যদি বিদ্যাপতির প্রাধান্য না থাকিত, তবে সহজেই এই 'খেলন কবি' লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেন।

বাংলা দেশ বিদ্যাপতিকে স্মরণে রাখিয়া তাহার গৌরবে কবির সঙ্গে নিজেকেও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। কবি বিদ্যাপতি মিথিলার হইয়াও বাঙ্গালীর চিরকালের মরমীয়া কবি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিয়া [চৈ. চ. ২।২] বৈষ্ণব সমাজের নিকট বিদ্যাপতিকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর সনৃত্য বিদ্যাপতি-গীতি-আস্বাদন [২।৩] চৈতন্যচরিত-কার কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় নিত্য-ভাস্বরতা লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবি-সমাজ বিদ্যাপতির প্রতি তাঁহাদের অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দদাস [কবি বিদ্যাপতি অভিমানে। যাক গীত জগতচিত রোয়ায়ল গোবিন্দগৌরী সরস রসগানে।] রাধামোহন ঠাকুর বিদ্যাপতিশ্চাণ্ডদাসো জয়দেবকবীশ্বরঃ। লীলাশুক প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ।], নরহরিদাস চক্রবর্তী [জয় বিদ্যাপতি কবিকুলা-নন্দ। রসিক সভাভূষণ সুখকন্দ।] প্রভৃতি মহাজনগণ বিদ্যাপতির জয় ঘোষণা করিয়াছেন নানাভাবে। বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে আপন গুরু হিসাবে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। বিদ্যাপতির অনেক অসমাপ্ত পদ তিনি পূরণ করিয়াছেন। ফলে, বিদ্যাপতির অনেক পদ গোবিন্দদাসের নামে প্রচলিত হইয়াছে, আবার গোবিন্দদাসেরও কিছু কিছু পদ বিদ্যাপতির নামেও দেখা যায়। বাংলা দেশের সাধারণ

মানুষ চণ্ডীদাসের মতো বিদ্যাপতিকেও কিংবদন্তীর কুঞ্জে আশ্রয় দিয়াছেন। একদিকে চণ্ডীদাস ও রামী এবং অন্যদিকে বিদ্যাপতি ও লছিমাদেবীকে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদকর্তাগণের আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে পদ-সংকলন গ্রন্থসমূহের বিচার করা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সংকলিত রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'কে প্রাচীনতম পদ-সংকলন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইহার পরেই রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই দুইখানি গ্রন্থই অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র বিষয়ক। ভাল পদ উদ্ধার করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না, রসের বিভিন্ন পর্যায়ের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহারা অনেকগুলি ভাল পদ উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ধৃতি না থাকিলে কয়েকজন কবির পরিচয় ও রচনা চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈষ্ণব সমাজে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র স্থান খুবই উচ্চে। 'রসকল্প-বল্লী'তে বিদ্যাপতির নামে ১২টি পদ এবং কবিরঞ্জন, শ্রীকবিরঞ্জন বা কবিরঞ্জন ঠাকুরের নামে ৫টি পদ এবং শেখর ঠাকুর বা কবিশেখরের নামে ২টি পদ ধৃত হইয়াছে। 'রসমঞ্জরী'তে বিদ্যাপতির ৬টি, কবিরঞ্জনের ৩টি এবং কবিশেখরের নামে ১টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থটিতে রামগোপাল দাস সংস্কৃত রসশাস্ত্রকে সংক্ষেপে দ্বাদশ কোরকে কাব্যের আকারে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। রসশাস্ত্র বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তিনি ১৯ জন পদকর্তার পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। লেখক আপন রচনাকে বিশ্লেষিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই অপরাপর পদকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস পিতার গ্রন্থের অষ্টম কোরককে অবলম্বন করিয়া 'রসমঞ্জরী' গাঁথিয়াছেন। 'রসমঞ্জরী'তে পিতার পথ অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতির ৬টি, কবিরঞ্জনের ৩টি এবং কবিশেখর নামাঙ্কিত ১টি পদ ধৃত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৪৫ জন কবির ৩০৯টি পদ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। ক্ষণদায় কবিরঞ্জন ভণিতায় ২টি, কবিশেখর ভণিতায় ২টি, বিদ্যাপতি ভণিতায় ২৮টি, শেখর

রায় ভণিতায় ২টি পদ আছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণির পর রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' [৭৪৬টি পদের সংগ্রহ], নরহরিদাস চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' [১১৬৯], গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' [১১১৯], দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত' [৪৪৯], বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' [৩১০১] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকল পদ-সংকলন-কর্তাই বিদ্যাপতির পদের মাধুর্যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদসমূহকে সগৌরবে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে কেহই কোন তথ্য রাখিয়া যান নাই। মিথিলার কবি কাব্য-পরিচয়ের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর একান্ত আপনজনরূপে চিহ্নিত হইয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার ব্যক্তি-পরিচয়ের কথা আপনা-আপনি বিস্মৃতির অন্তরালে রহিয়া গিয়াছিল।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজী-শিক্ষিত নবজাগ্রত যুবসমাজের অনুসন্ধিৎসা প্রাচীন বাংলার কবি ও কাব্য সম্পর্কে জাগ্রত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন কবিগণের পরিচয় জানিবার ও কাব্যসমূহের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবার আন্তরিক আগ্রহ তাঁহাদিগকে গবেষণার পথে চালিত করে। ফলে, প্রাচীন কবিগণ আপন আপন পরিচয়ে স্ব স্ব মহিমায় সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত হইতে থাকেন। বলা বাহুল্য, তখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস ছিল না। এ-বিষয়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধার্থসংগ্রহে' তিনি 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন এবং ইহাতে প্রাচীন বাংলার বৈষ্ণব কবি-সমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন ও প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত করেন। ইহার পর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবি-চরিত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি সম্পর্কে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে অনুসরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় শত বৎসর পূর্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতকগুলি

অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" বিদ্যাপতির দুইটি পদের উদ্ধৃতি দিয়া চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখা ২৬ পল্লব অনুসরণ করিয়া সমসাময়িক কবিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সংগ্রহের' উল্লেখ করা যাইতে পারে। উভয় গ্রন্থেই বিদ্যাপতির জনশ্রুতি-নির্ভর জীবনকথা ও পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ একই পথ অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতির আলোচনা করিয়াছেন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, তাঁহার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি সম্পর্কে নূতন কোন তথ্য নাই, এ-কথা সত্য : কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার দীর্ঘ বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন

রামগতি ন্যায়রত্নের পর বিদ্যাপতির জীবন ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন John Beames, Indian Antiquary(Vol. II. 1873) পত্রিকায়। "The Early Vaishnava Poets of Bengal. 1. Vidyapati" প্রবন্ধে জন বীম্‌স বিদ্যাপতির প্রতি ঐতিহাসিক বিবেকসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যাপতির জীবনকথা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিদ্যাপতি ভবানন্দ রায়ের পুত্র এবং যশোহরের বাড় নাটোর [Barnator, বড় নাটোর] গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯২৯ সংবৎ-এর [১৮৭২ খ্রীঃ] ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত একটি পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পত্রে লেখক জানাইতেছেন যে, "জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শটুর নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণ জাতীয় ভবানন্দ রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক হয়। উহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায়—বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র।" সম্ভবতঃ এই পত্র এবং অপরাপর জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া জন বীম্‌স বিদ্যাপতির এইরূপ পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমার প্রসঙ্গও উল্লেখ করিয়াছেন। নিছক জনশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য

বিচার করিয়া বিদ্যাপতি যে বাংলা দেশের কবি নহেন, তাঁহার জন্মস্থান মিথিলার মধুবনী পরগনার অন্তর্গত বিসফী গ্রাম, তাহা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে [১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে] 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় আপন নাম গোপন করিয়া 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। আধুনিক মৈথিল লেখকগণ সময়ে অসময়ে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে নিজের দেশের লোক বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজেও বাঙ্গালী এবং তিনি অন্ধ প্রাদেশিকতার বশবর্তী হন নাই,—এ-কথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রাক্-রাজকৃষ্ণ যুগে বিদ্যাপতির বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে ধারণা একান্ত ভিত্তিহীন ছিল না। বিদ্যাপতির ভাব কিছুটা লইয়া তাঁহারই নাম দিয়া সাদা বাংলায় অনেক পদ রচিত হইয়াছিল। সেগুলিকে কোনক্রমেই মৈথিল কবির রচনা বলা চলে না। যাহাই হউক, বিদ্যাপতি সম্পর্কিত এই ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পরেই জন বীম্‌স Indian Antiquary (Vol. IV : 1875—Pp. 299) পত্রিকায় "On the Age and Country of Vidyapati" প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত প্রবন্ধটির সার-সংক্ষেপ এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রায় সকল সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়া সমকালীন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জন বীম্‌স্। এই সময় G. A. Grierson-এর 'An Introduction to the Maithili of North Bihar, Chrestomathy and Vocabulary' প্রবন্ধটি Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal (XLIX, XLI, Pp. 34. Calcutta 1880 – 82) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি তখন কর্মব্যপদেশে মধুবনীতে ছিলেন এবং ঐ অঞ্চল হইতেই বিদ্যাপতির মাত্র ৮২টি পদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। পরে গ্রীয়ার্সন সাহেব বিদ্যাপতি বিষয়ে আরো দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'Vidyapati and His Contemporaries' (Indian Antiquary—Vol. XIV, 1885, Pp. 1824) এবং 'The Modern Vernacular Literature of Hindusthan' (1889) প্রবন্ধে

বিদ্যাপতি সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিলেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলারই কবি।

বিদ্যাপতি সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহ গ্রন্থসমূহের আলোচনাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'মহাজন পদাবলী' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই সংকলন গ্রন্থে ৪৩ হইতে ৪৮ সংখ্যা পর্যন্ত বিদ্যাপতির পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার পর চুঁচুড়া হইতে বিভিন্ন মাসে খণ্ডে খণ্ডে 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' [১৮৭৪—৭৬ খ্রীঃ] অসম্পূর্ণভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়কুমার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। শুধুমাত্র বিদ্যাপতির পদ লইয়া ১২৮০ বঙ্গাব্দে [১৮৭৩ খ্রীঃ] চুঁচুড়া হইতে 'মহাজন পদাবলী সংগ্রহ' [প্রথম খণ্ড—প্রথম ভাগ] প্রকাশ করেন জগদ্বন্ধু ভদ্র। সারদাচরণ মিত্র ১২৮৫ বঙ্গাব্দে [১৮৭৮ খ্রীঃ] বিস্তৃত ভূমিকাসহ 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশ করেন। ইহাতে পদের টীকা-সম্বলিত মূল পাঠ পাওয়া যায়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারও সটীক 'বিদ্যাপতি পদাবলী' চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ করেন। ইহার পরে বাংলা দেশে বিদ্যাপতি-চর্চা বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। বিদ্যাপতির পদ ছাড়াও, অপরাপর গ্রন্থগুলি মূল মৈথিল হইতে অনুবাদ করা হয়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পঞ্চানন তর্করত্ন, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়. অক্ষয়কুমার দে, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের সম্পাদনায় বিদ্যাপতির পদ-সংকলন গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদ-সংকলন গ্রন্থ হইল পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'নব আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদাবলী' [১৯০০ খ্রীঃ]। নেপালের রাজদরবারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে 'প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাবলী'র [১৭ ভাগ : কলিকাতা ১৯০০—৬০ খ্রীঃ] প্রথমাংশে বিদ্যাপতির পদগুলি তিনি প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাপতির পদ-সম্পাদনা এবং আলোচনার ক্ষেত্রে এই পাঠ বিশেষ মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহার পর নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায়ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের

পদাবলী' নামে বিস্তৃত ভূমিকা, কবি-জীবনী ও টীকাসহ প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠার এক বিপুল সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের বিদ্যাপতি পদ-সংগ্রহের অন্যতম সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিত্র [ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের সহযোগিতায়] তৎসম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"পরে ঐ সংস্করণ [নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংস্করণ] নিঃশেষিত হইলে ১৩৪১ সালে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের উপর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি ঐ পদগুলি সাজাইয়া এবং কতকগুলি নূতন পদ সংযোজিত করিয়া ঐ সংস্করণ প্রস্তুত করেন। সারদাচরণ মিত্রের সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র প্রথম খণ্ডরূপে এই পদগুলি প্রকাশ করেন [১৯৩৪ খ্রীঃ]। উহার সাত বৎসর পরে বন্ধুবর অমূল্যচরণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শরৎবাবু ঐ সংস্করণ সম্পূর্ণ করিবার ভার আমার উপর অর্পণ করেন, আমি ৩১০-সংখ্যক পদ হইতে সমস্ত অবশিষ্ট পদের ব্যাখ্যা করিয়া একটি শব্দসূচীসহ উহা সম্পাদন করি।" এই সংস্করণ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নিঃশেষিত হইলে পর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের যুগ্ম সম্পাদনায় 'বিদ্যাপতির পদাবলী' ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে [১৯৫৩ খ্রীঃ.] প্রকাশিত হয়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর নূতন সংস্করণ প্রস্তুতকালে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারকে সম্পাদন করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি বিদ্যাপতির জীবনী এবং কবিকর্ম সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন Journal of the Bihar Research Society, Patna University Journal, নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্র-পত্রিকায়। মিত্র-মজুমদারের সম্পাদিত গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির পদ-সংকলন গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে সুচিহ্নিত। ডক্টর মজুমদার এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাপতির কাল এবং তাঁহার পদ-রচনার কাল সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। পদ সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রতিটি পদের আকর, বিভিন্ন পুঁথির পাঠান্তর দিয়া সম্পাদনাকে অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন

এবং ইহাই (তাঁহার অবলম্বিত রীতি) এ পর্যন্ত পণ্ডিতবর্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বলাবাহুল্য বিদ্যাপতি আলোচনার ক্ষেত্রে [কি কবি-জীবনী অথবা পদাবলী তথা কবিকর্ম সম্পর্কে] বর্তমানে ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি-পদাবলী'র পর বাংলায় বিদ্যাপতির পদাবলী এবং আলোচনা গ্রন্থ আরও বহু প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেগুলিতে মৌলিক কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। আলোচনার ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি-শতক' [১৯৫৪ খ্রী:] অবশ্য স্মরণযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলন গ্রন্থটিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতি বিষয়ক আলোচনার ইতিবৃত্তে এ পর্যন্ত বাংলা হরফে মুদ্রিত গ্রন্থের আলোচনা করা গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত পদ-সংকলন এবং আলোচনা গ্রন্থের বিষয় বিবৃত করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাপতি যদিও মৈথিল কবি তথাপি তিনি একান্তভাবেই বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গালীর নিকট হইতে মিথিলা বিদ্যাপতিকে স্বমহিমায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলে, বাংলা দেশে বিদ্যাপতি-চর্চার বহু পরে হিন্দি ভাষায় বিদ্যাপতি-চর্চা আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' গ্রন্থটি বহু পূর্বেই হিন্দিতে অনুদিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক হইলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের প্রধান মুনসী তারিণীচরণ মিত্র। অনুবাদ গ্রন্থটি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর কমলানন্দন সিংহের 'মহামহোপাধ্যায় কবিবর বিদ্যাপতি ঠাকুর' [১৯০২ খ্রীঃ], ব্রজনন্দন সহায় সম্পাদিত 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি' [পাটনা, ১৯১০], নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি ঠাকুর কি পদাবলী' [এলাহাবাদ, ১৯১০], রামবৃক্ষ বেণীপুরী সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি কি পদাবলী' [লাহোর, ১৯২৬], শিবনন্দন ঠাকুর সম্পাদিত 'বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি পদাবলী' [দ্বারভাঙ্গা ১৯৪১] প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে মিত্র-মজুমদারের বিদ্যাপতি-পদাবলীর হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের পর যে সংকলন-গ্রন্থসমূহ

প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে দুইটি সংকলন-গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র নেপাল পুঁথির উপর ভিত্তি করিয়া ডক্টর সুভদ্র ঝা 'বিদ্যাপতি-গীতসংগ্রহ' [or, The Songs of Vidyapati] হিন্দী এবং ইংরাজীতে [১৯৫৪ খ্রীঃ] প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনা এবং পদবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে এই সংকলন গ্রন্থটির মূল্য অসাধারণ। তথাপি বিদ্যাপতির পদের অর্থবিচার-প্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদারের গ্রন্থমূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি লিখিয়াছেন— "...Majumder has made the meaning clear than I have done." অপর গ্রন্থটি হইল বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষৎ [পাটনা] হইতে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি-পদাবলী [প্রথম ভাগ, ১৯৫১]। ইহা কেবলমাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের ন্যায় নেপাল পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদ-সংকলন গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর হিন্দী সংস্করণ। এই প্রসঙ্গে মিত্র-মজুমদারের সম্পাদিত পদাবলীর আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র এই গ্রন্থেই একাধিক বিদ্যাপতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বিশেষভাবে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচিত ৩০টি পদকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হইয়াছে। বিদ্যাপতি আলোচনার ক্ষেত্রে ইহা যুগান্ত-কারী ঘটনা বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে। ইহার পূর্বে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বাঙ্গালী বিদ্যাপতিব অস্তিত্ব সম্পর্কে এক প্রবন্ধ ভারতবর্ষ পত্রিকায় [১৩৩৬ ভাদ্র] প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য, তাহার পূর্বেও গৌরগুণানন্দঠাকুর 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' [৪২৪ মাঘ গৌরাঙ্গ] গ্রন্থে শ্রীকবিরঞ্জন সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন-- "এই কবির নিবাস শ্রীখণ্ড। জাতি বৈদ্য। প্রসিদ্ধ পদকর্তা। দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল।" কারণ, এ পর্যন্ত কোন পদ-সংকলন-কর্তা বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া কোন পদকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন নাই। বাঙ্গালী বিদ্যাপতি তথা বাংলাদেশে প্রাপ্ত

বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত পদসমূহের রচনাকারি বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে, মৈথিল বিদ্যাপতির নামে যে সকল পদ বাংলা দেশে প্রচলিত আছে [প্রায় নয় শতাধিক পদ], সেই সমস্ত পদের রচয়িতা অনেকক্ষেত্রেই প্রখ্যাত কবি বিদ্যাপতি নহেন, সেগুলি বাংলা দেশের বিভিন্ন কবির রচনা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা বিদ্যাপতির পদ বা পদের কোন কোন ছত্র বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া নূতন নূতন পদ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচনাসমূহে বিদ্যাপতির নাম সংযুক্ত করিয়া কালের তরণীতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন ও মধ্য যুগে কবিগণের খ্যাতির মোহ হয়তো বিশেষ ছিল না। তাই দেখিতে পাই, পুরাণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বহু লোকে রচনা করিয়া ব্যাসদেবের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। অনেক বৈষ্ণব কবি সম্পর্কেও একই কথা বলা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির ভণিতায় বহু বাঙ্গালী কবি নিত্যকালের বন্দরে আপন আপন কাব্যের পসরা পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁহাদের সাফল্য এত অধিক যে, বিদ্যাপতি এবং অ-বিদ্যাপতির রচনা আজ প্রায় অনেকাংশে অভিন্ন রূপ লইয়া বিদ্যমান। বর্তমান নিবন্ধে বিদ্যাপতির ভণিতার পদ-সমুদ্র হইতে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন কবির কাব্যরূপের পরিচয় লওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য।*

---

* বিদ্যাপতি-চর্চার কালানুক্রমিক সুনির্বাচিত সূচী পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদের সম্ভাব্য রচয়িতাগণ

এক

বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত বৈষ্ণব পদাবলীর রাজ্য,—চিরকালের বাঙ্গালী রসিক সমাজের 'হৃদি বৃন্দাবন'। মন-মধুকরের সেখানে অবাধ আধিপত্য। কিন্তু এই পদামৃত-সমুদ্রের সৃষ্টি যে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির একক সৃষ্টি নয়, তাহা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে 'বিদ্যাপতি কবিগোষ্ঠী' (পৃঃ ৫৮) গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেন মহোদয় একটি মন্তব্য করিয়াছেন। "বিদ্যাপতি আজ অবধি যে কবিখ্যাতি পেয়ে এসেছেন তার অনেকটাই তাঁর পূর্বগামী এবং অনুগামী কবিদের প্রাপ্য। উমাপতি বিদ্যাপতির প্রায় একশ বছর আগেকার কবি। এঁর একাধিক পদের ভাব বিদ্যাপতির নামিত পদে বিস্তারিত ও তরলিত হয়েছে। পরবর্তী অনেক শক্তিমান কবিও যে বিদ্যাপতির মত, এমন কি তাঁর চেয়েও ভালো পদ লিখেছেন, তা গীত-ত্রিংশতিকা অংশ[১] পড়লে বোঝা যাবে। বিদ্যাপতি বড় কবি এবং তিনি অনেক ভালো পদ লিখেছেন। তবুও যাঁরা বিদ্যাপতি পদাবলীর মত্ত মধুকর তাঁদের আমি এইটুকুই বলবো যে বহু স্থান-কাল-পাত্রের মধু শুধু একজনের সঞ্চয় মনে করে তাঁরা কল্পনার চক্র গড়ে তুলেছেন। ইতিহাসের চর্চা ও সাহিত্যের আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয় স্বীকার করি। কিন্তু ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করে সাহিত্য হতে পারে, আলোচনা চলে না। ভাবকল্পনার ভাঁটিতে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সাহিত্য-রস চোলাই করবার আগে পদগুলি ভালো করে বেছে নেওয়া দরকার।" এই প্রয়োজনবোধের ক্ষেত্রে ডক্টর সেন তাঁহার উপর্যুক্ত গ্রন্থে কবি যশোধর, কবি-রতনাশ্রী, ভানু, রুদ্রধর, গজসিংহ, গোবিন্দদাস, কংসনারায়ণ, জীবনাথ, অমিয়কর, ধরণীধর, ভবানীনাথ, প্রীতিনাথ, কবি-কুমুদী এবং

---

১ ডক্টর সুকুমার সেন রচিত 'বিদ্যাপতি কবিগোষ্ঠী' গ্রন্থের শেষাংশে প্রকাশিত ত্রিশটি পদের সংকলন।

লখিমীনাথ সম্পর্কে পৃথক পর্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন।[১] তাঁহারই আলোচনার ধারা অনুসরণ করিয়া ভাবের জগৎ হইতে বস্তুর জগতে বিদ্যাপতির বিপুল পদ-সমুদ্র হইতে "বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদের সম্ভাব্য রচয়িতাগণ" সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা গেল। এই আলোচনার পূর্বে বিদ্যাপতিরূপে পরিচিত বিভিন্ন কবি এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ নিম্নে আলোচিত হইল।

'বিদ্যাপতি' শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। "বৃহস্পতি বাচস্পতি ইত্যাদির মত বিদ্যাপতি শব্দটিও খুব পুরানো, যদিও বৈদিক এবং ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে মেলেনি। শব্দটি বৈদিকের চেয়েও প্রাচীন, কেন না এটি প্রাচীন ইরাণীয় ভাষায় পাওয়া গেছে। আবেস্তায় সোমদেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে "বএদ্যাপইতে" (অর্থাৎ বিদ্যাপতে) বলে। অর্বাচীন সংস্কৃতে "বিদ্যাপতি" প্রথম পাই কবির নামরূপে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বিদ্যাপতি কবি মিথিলার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইনি ছিলেন কর্ণদেবের সভাকবি। এঁর লেখা পাঁচটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে।...... মৈথিল কবি দ্বিতীয় বিদ্যাপতিই আসল অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি"[২] ইহা ছাড়া, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির কাব্য-পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী লেখক বিদ্যাপতি, এমন কি 'বৈদ্য রহস্য' নামধেয় চিকিৎসাগ্রন্থের লেখক বংশীধর বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি নামধেয় কবি-সমাজের শিরোমণি অবশ্যই মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত পদসাহিত্য হইতে মৈথিল কবির রচনা খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই দুষ্কর। বহু কবির কাব্য-সাধনা বিদ্যাপতি-মধুচক্রে লীন হইয়া গিয়াছে। মৈথিল কবির গৌরব হ্রাসের আশঙ্কা তাহাতে নাই। কারণ, তিনিই ছিলেন সেকালের কবি-সম্রাট, তাই তাঁহারই আশ্রয়ে এই কাব্যভূমির সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল।

১। ডক্টর মজুমদার রচিত 'Maithil Poets in the Age of Vidyapati' (Pat. University Journal, Jan. '48) প্রবন্ধেও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

২। ডঃ সুকুমার সেন 'বিদ্যাপতি কবিগোষ্ঠী' [পৃঃ ৫]

কবি বিদ্যাপতি মিথিলার হইয়াও বাঙ্গালীর হৃদয় মন্দিরে নিত্যকাল অর্ঘ পাইয়া আসিতেছেন। বিদ্যাপতিকে তাঁহারা একান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহু কবিকেও তাঁহারা বিদ্যাপতির নামের তরণীতে তুলিয়া দিয়া বিদ্যাপতির কলেবরকে বিপুলতর করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু রসিক সমাজ নন, বাংলা দেশের তৎকালীন কবি-সমাজও বহু ক্ষেত্রে তাঁহাদের কবিকর্ম বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে, নিছক বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদসমূহের মধ্যে বিদ্যাপতি এবং অ-বিদ্যাপতির পদ খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। এই সমস্যা কঠিনতর হওয়ার কারণ, মৈথিল কবির ব্যবহৃত উপাধিগুলির অন্তরালে বাংলা দেশের কবিগণের আত্মগোপন। এই সমস্যা যেমন সত্যই বৃহৎ, তেমনি এই সমস্যার অন্তরালে ইহার সমাধানের উপায়ও যে একেবারে লুপ্ত নাই, তাহা বলা যায় না। বিদ্যাপতির পদগুলি বিচার করিলে বিভিন্ন উপাধি এবং নামের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশের পদগুলিতে খুব বেশী সংখ্যক নাম ও উপাধি যুক্ত নাই সত্য, তবে যে সকল নাম ও উপাধি পাওয়া যায় সেগুলির বিচার করা প্রয়োজন। বাংলা দেশে বিদ্যাপতি নামে প্রচলিত পদসমূহে কবিরঞ্জন, কবিশেখর, নব কবিশেখর, শেখর, শেখররায়, ভূপতি, চম্পতি, নৃপতি এবং বল্লভ ভণিতা পাওয়া যায়। রামভদ্রপুর, তরৌণির পুথি এবং গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত পদে বিদ্যাপতির কবি কণ্ঠহার, সরস কবি কণ্ঠহার ভণিতা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির 'কবি কণ্ঠহার' উপাধির প্রয়োগ দেখা যায় বিদ্যাপতি-রচিত 'গোরক্ষবিজয়' নাটকে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর উমেশ মিশ্র এবং ডক্টর জয়কান্ত মিশ্র সম্পাদিত 'Facsimile of Vidyapati's Gorakshavijaya' গ্রন্থটি অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতি [এলাহাবাদ] কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতির নিম্নরূপ ভণিতা পাওয়া যায়,—"ধরম রাখি ঘন ভরিঅ ভণ্ডার। ভণই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার [পৃঃ ৫ খ]।" সেইজন্য এই উপাধিযুক্ত পদগুলিকে বিদ্যাপতির বলিয়া

মানিয়া লওয়া হয়। বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদসমূহে এই কয়টি উপাধির প্রয়োগ দেখা যায় না। নেপাল পুথিতে 'সরস কবি বিদ্যাপতি', 'সরস কবি ভাণে' বা 'সরস ভাণ' ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে বিদ্যাপতির বলিয়াই স্বীকার করা হয়। বিসফীর দানপত্র যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহা হইতে জানা যায় কবির অন্যতম উপাধি ছিল 'অভিনব জয়দেব'। নেপাল এবং রামভদ্রপুরের পুথিতে 'অভিনব জয়দেব' ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়াই 'অভিনব জয়দেব' ভণিতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু শুধু 'জয়দেব' ভণিতাযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'হরগৌরী পদাবলী'র ৪০-সংখ্যক পদটিকে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বাংলা দেশে প্রাপ্ত ভণিতাসমূহের বিচার-প্রসঙ্গে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় বলেন,—"নেপালের রামভদ্রপুরের ও নগেন্দ্রবাবুর তরৌণির তালপত্রের পুথিতে এবং রাগতরঙ্গিণী কিংবা গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহে এমন একটি পদও নাই যেখানে বিদ্যাপতির নামের সহিত 'কবি শেখর', 'শেখর', 'নবকবিশেখর', 'চম্পাতি' অথবা 'কবিরঞ্জন' উপাধি যুক্ত আছে। নেপালের ও মিথিলার আকর পুথিতে 'কণ্ঠহার' উপাধি থাকিলেও বাংলা দেশের প্রাচীন পদ-সংকলন গ্রন্থগুলিতে এমন একটি পদও নাই যেখানে বিদ্যাপতির নামের সহিত 'কণ্ঠহার' যুক্ত আছে" [বি, পদাবলী ভূমিকা, পৃঃ ৫] এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত পদগুলির বিচার করা প্রয়োজন। এই পদগুলির আভ্যন্তরীণ প্রমাণের মধ্য দিয়া বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলির সম্ভাব্য রচয়িতাগণের পরিচয় উদ্ঘাটিত হইবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 'কবিরঞ্জন' ভণিতাযুক্ত পদের আলোচনা করা গেল।

॥ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ॥

কবিরঞ্জন ভণিতায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। কবিরঞ্জনের পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়াই বিবেচনা হয়।" গুপ্ত মহোদয় এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পদকল্পতরুতে ধৃত ৭টি পদের মাত্র ৩টিকে তিনি তাঁহার সংকলন-গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। স্বভাবতঃই বলা যাইতে পারে, অপর

৪টি পদের বিচারে তিনি বিদ্যাপতির বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কবিরঞ্জনই যে বিদ্যাপতি, এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনুমানমূলক। কারণ, রামগোপাল দাস রঘুনন্দনের শাখা-নির্ণয়ে লিখিয়াছেন,—

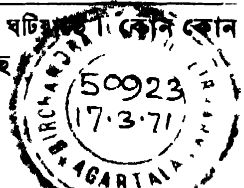
কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড।
প্রভুর বর্ণনা পদ কবিলেন দৃঢ॥
.. ..
ছোট 'বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গ ম॥

কবিরঞ্জন সম্পর্কে ইহাই প্রাচীনতম উল্লেখ। রামগোপাল দাস তাঁহার রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে কবিরঞ্জনেব ৫টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে সেই পদগুলির প্রথম চরণ দেওয়া গেল।

১।	নবদরশনে নবীন নারী	ষষ্ঠ কোরক
২।	পদ্মপিছর ন শ কাঙ্গর কঁ ে	অষ্টম কোরক
৩।	যামুনে কুঞ্জ রহল বনমালী	অষ্টম কোরক
৪।	চরণ নখর মণি	অষ্টম কোরক
৫।	উদশল কুন্তল ভার:	অষ্টম কোরক

রামগোপাল দাস এই কবিকে 'ছোট 'বিদ্যাপতি' বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন। কবিত্ব- খ্যাতিতে যিনি প্রায় বিদ্যাপতির সমকক্ষ, তাঁহারই ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্য দিয়া প্রমাণিত হয় এই সূত্র অনুসরণ করিয়া কবিকে বিদ্যাপতি নামে চিহ্নিত করিলে অযৌক্তিক হয় না সত্য, তবে তিনি যে মৈথিল কবি-সম্রাট বিদ্যাপতি নহেন তাহা অনস্বীকার্য। কবিরঞ্জনের পদ যে বিদ্যাপতির ভণিতাতেও প্রচারিত হইত, তাহার প্রমাণ উপর্যুক্ত চতুর্থ 'চরণ-নখর-মণি' পদটি। পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ পদ-সংগ্রহ 'পদকল্পতরু'তে এই পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় আছে।* কবিরঞ্জন ভণিতায় এ পর্যন্ত খুব বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। রসকল্পবল্লীতে ধৃত

* এই ভণিতা-বিভ্রম 'পদ্মপিছরনিশি' পদটিতেও ঘটিয়াছে। কোন কোন অর্বাচীন পুথিতে এই পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত হইয়াছে।



পদসমূহের পরেই রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে কবিরঞ্জন ভণিতায় তিনটি পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'চরণ-নখর-মণি' এবং 'পন্থপিছরনিশি' পদদ্বয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ফলে কবি-রঞ্জনের মাত্র ১টি নূতন পদ 'দৃঢ় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি' পাওয়া যায়। প্রথম পদটিও যে বিদ্যাপতির নামে চলিত ছিল, তঁাহার প্রমাণ বরাহ ১১-সংখ্যক পুথি [পদ ৫১] এবং পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি। এই উভয় পুথির ভণিতাতেই 'কবিরঞ্জন' স্থলে 'বিদ্যাপতি' আছে। 'রসমঞ্জরী'-র পরেই বাংলা দেশের প্রাচীনতম পদ-সংকলন গ্রন্থ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'-র উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভণিতায় মাত্র দুইটি পদ ধৃত হইয়াছে। এই পদ দুইটির প্রথম ছত্র হইতেছে…

১। শ্যামর গৌর-বরণ এক দেহ। মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ৮৮-সংখ্যক পদ।
২। কবে সে হইবে মোর শুভদিন। মিত্র মজুমদার সংস্করণের ২৬৫-সংখ্যক পদ।

প্রথম পদটির উল্লেখ করিয়া রামগোপাল দাস তাঁহার শাখা-নির্ণয়ে কবিরঞ্জনের পরিচয় দিয়াছেন। পদটি যে খুবই প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। কারণ, রামগোপাল দাস ইহার উল্লেখ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, বাহুল্যবোধে সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করেন নাই। এই বহু-খ্যাত পদটি যে স্বাভাবিকভাবেই পদ-সংকলন গ্রন্থে স্থান পাইবে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবিরঞ্জনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি পদ-কল্পতরুতে [২১৮৯] এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী' গ্রন্থে কবিশেখর বা রায়শেখরের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই পদে কবির পরিচয় কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে।

ত্রিপুরা চরণ-কমল-মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥

ত্রিপুরা-চরণাশ্রিত কবির পদটি বৈষ্ণব সমাজ শিরোভূষণরূপে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু ত্রিপুরা-চরণাশ্রিত কবিকে তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাই পদটি নিশ্চিতভাবে কবিরঞ্জনের হওয়া সত্ত্বেও কবিশেখরের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে হইবে, কবিশেখর ও কবিরঞ্জন যদি অভিন্ন হন, তবে আর

কোন সমস্যা থাকে না। এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী অংশে দিতেছি। তাহার পূর্বে কবিরঞ্জন ভণিতায় মোট পদ কতগুলি পাওয়া যায়, তাহা দেখা প্রয়োজন। প্রাচীনতম পদ-সংকলন গ্রন্থ 'রসকল্পবল্লী' হইতে সুরু করিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদ-সংকলন গ্রন্থসমূহের কবিরঞ্জন ভণিতার যে সকল পদ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার একটি সূচী দেওয়া গেল।

১।	নবদরশনে নবীন নারী	বল্লী ৮৫
২।	যামুনে কুঞ্জে রহল বনমালী	বল্লী ১১৫
৩।	পঙ্কপিছধনি শিখ কাজর কাঁতি	বল্লী ১১৭, মঞ্জরী ২৬৮
৪।	চরণ-নখর-মণি রঞ্জন ছান্দ	বল্লী ১১৯, মঞ্জরী ৩০৮, সং ৪১৭, হ. ম. ৭
৫।	উদশল কুন্তল ভারা	বল্লী ১৬৩, সমুদ্র ২৭৭, তরু ১০৭৮, মাধুরী ৩।৫৬৫, হ. ম. ৮
৬।	দঢ় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি	মঞ্জরী ২৬৭
৭।	শ্যামর গৌর-বরণ এক দেহ	ক্ষণদা ৮৮, তরু ২১৮০, গৌ ত ১০ হ. ম. ১
৮।	কবে সে হইবে মোর শুভদিন	ক্ষণদা ২৬৫, তরু ২১২, কী ২৬২ (অপ্র ২০৩) হ. ম. ৩
৯।	কি পুছসি এ সখি কানুক সনেহ	সমুদ্র ৪০৪, সং ২৯৫, তরু ৬৮০, কী (অপ্র ৫২৭), মাধুরী ২।৬১১ হ. ম. ৫
১০।	কি কহব রে সখি আজুক বিচার	তরু ২৫৬, মাধুরী ১।৪০৯, হ. ম. ৪
১১।	পুরখ রতন বেরি মন ভেল ভোর	তরু ৯৬৪, কী (অপ্র ৬২৯), হ. ম. ৬
১২।	কিবা কব রাইয়ের গুণের কথা	তরু ১১০৪, হ. ম. ৯
১৩।	(আরে) সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব।	তরু ১৭৬০, মাধুরী ৪।১৬১, হ. ম. ১০
১৪।	পরিহর মনে কিছু না কর তরাস	কী ১৬৪, ন. গু ১৩৭
১৫।	মাধব ধনি আন লোচন ভাঁ'ত	কী ১৮৬ (অপ্র ৩৪৬), ন. গু. ২৮৫
১৬।	এ দূতি দয়াময়ি কর অবধান	কী (অপ্র ৮৫৬), বরাহ পুথি ২৬৫৪ (১২০৭ সাল), ২৬৫৫ (১২১১ সাল)
১৭।	মহানস ব্রজভূমি মাহ	হ ম. ২৯৭

পূর্বালোচিত পদগুলি (রসকল্পবল্লী, রসমঞ্জরী ও ক্ষণদায় উল্লিখিত) ছাড়া এখানে নূতন ৯টি পদ পাওয়া গেল। ফলে, মোট ১৭টি পদ কবিরঞ্জনের ভণিতায় দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, উপর্যুক্ত

দশম পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৬৬-সংখ্যক [পদ ৫১] পুথিতে এবং চতুর্দশ পদটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংকলনে (অর্বাচীন পুথির ভিত্তিতে) বিদ্যাপতি ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, কীর্তনানন্দের অপ্রকাশিত সম্পূর্ণ দুইটি প্রাচীন পুথি হইতে একটি নূতন পদ (ষোড়শ) এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বৈষ্ণব পদাবলী" হইতে কবিরঞ্জনের আর একটি নূতন পদ উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরঞ্জন ভণিতায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত পদের সংখ্যা ১৭টি। এখন বিচার করা প্রয়োজন, কবিরঞ্জন এবং কবিশেখর একই ব্যক্তি কি না। কবিরঞ্জনের তিনটি পদ বিদ্যাপতি ভণিতায় এবং একটি পদ গোবিন্দদাস ভণিতায় শুধুমাত্র অর্বাচীন পুথিতেই মিলিয়াছে তাহা দেখাইয়াছি। কবিরঞ্জনের একটিমাত্র পদ [শ্যামর গৌর-বরণ] কবিশেখর ভণিতায় পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পদটি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইহার মাধুর্যে রসিক বৈষ্ণব সমাজ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা তন্ত্র-প্রভাবিত শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব কবি কবিরঞ্জনের এই রচনাটিকে কবিশেখরের নামে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভণিতার এই রূপান্তর খুব দ্রুত হয় নাই। তাহা হইলে ক্ষণদাতেই এই রূপান্তর লক্ষ্য করা যাইত। আবার, এই রূপান্তরও যে শুধুমাত্র 'কবিশেখর' পর্যায়ে থামিয়া গিয়াছে তাহা নয়। জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত গৌরপদ তরঙ্গিণীতে এই পদটির একটি নূতন ভণিতা পাওয়া যায়।

কবি গৌর-চরণ কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত মাধবী দাস ভান॥

'কবিরঞ্জন', 'কবিশেখর' সরিয়া গিয়া মাধবী দাস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 'গৌরচরণ-কমল মধু পান' যে 'ত্রিপুরাচরণ-কমল-মধুপান'কে সজোরে পরিবর্তিত করিয়াছেন তাহা সহজেই মনে হয়। যাহাই হউক, রসকল্পবল্লী, ক্ষণদা পদরসসারের পাঠ অনুসরণ করিয়া এই পদটিকে কবিরঞ্জনের না বলিয়া উপায় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পদকল্পতরুর অন্ততঃ একটি পুথিতে [প. ত., পৃঃ ৩] এই প্রাচীন পাঠের সমর্থন আছে। এই পদটি ছাড়া বাকী ১৬টি পদের কোনটিই এ পর্যন্ত কোন সংকলন-গ্রন্থে কবিশেখর নামের সহিত যুক্ত

হয় নাই। অপরদিকে কবিশেখর, নব কবিশেখর, শেখর, শেখর রায় প্রভৃতি ভণিতার একটি পদেও কবিরঞ্জনের সংযুক্তি দেখা যায় না; কবিরঞ্জন ও কবিশেখর অভিন্ন হইলে, একই পদ দুই ভণিতায় প্রচুরভাবে পাওয়া যাইত, সন্দেহ নাই কবিরঞ্জন ও কবিশেখর যে একই ব্যক্তি নহেন, এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। রামগোপাল দাস শ্রীশ্রীরঘুনন্দনঠাকুর প্রভুর শাখা-নির্ণয়ে যেমন কবিরঞ্জনের উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি রসিক দাসের সহযোগিতায় যে শাখা-নির্ণয় রচনা করিয়াছেন, তাহাতে একজন কবিশেখরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও রঘুনন্দনের শিষ্য। কবিরঞ্জন ও কবিশেখরকে অভিন্ন দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ডক্টর সুকুমার সেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"কবিশেখর ও কবিরঞ্জন দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ধরিতে আমাদের আপত্তি আছে। দুইজনেই বৈদ্য, শ্রীখণ্ডবাসী, রঘুনন্দনের শিষ্য ; দুইজনেই পদ লিখিয়াছেন একই রীতিতে।······আমার মনে হয় কবিরঞ্জন কবিশেখরেরই নামান্তর বা উপাধিভেদ [বা. সা. ই., পৃঃ ২১৯]।" অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারও অন্যতম যুক্তি—"কবিশেখর ও কবিরঞ্জন উভয়েই রঘুনন্দনের শিষ্য এবং উভয়ের পদের রচনারীতি এক [বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃঃ ৩৭৪]।" ইহারা উভয়েই নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোথাও বা রামগোপাল দাসকে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কোথাও বা বর্জন করিয়াছেন। কবিশেখর ও কবিরঞ্জন যদি এক ব্যক্তিই হইবেন, তবে তাঁহাদের পৃথকভাবে উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা অভিন্ন নহেন বলিয়া এই স্বতন্ত্র উল্লেখ। দ্বিতীয়তঃ, একই গুরুর দুই শিষ্য হওয়া কিভাবে অসম্ভব, তাহা কল্পনাও করা যায় না। তৃতীয়তঃ, একই ভাবধারা অববম্বন করিয়া যদি দুইজন কবি পদ রচনা করেন, তবে তাঁহারা কিজন্য অভিন্ন হইবেন তাহাও ইঁহারা স্পষ্ট বলেন নাই। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্তের কোনও অভাব নাই। ডক্টর সেনের মত সমর্থন করিয়া ডক্টর শহীদুল্লাহ্ 'বিদ্যাপতি শতকে'র ভূমিকায় [পৃঃ ।৵০] আরও একটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের [বিদ্যাপতি-পদ-সংগ্রহের]

৫৩৩নং ও ৫৪৩নং পদ দুইটি যে একই কবির রচনা তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ৫৩৩নং পদের ভণিতায় কবিশেখর এবং ৫৩৪নং পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি।" পদ দুইটিতে জটিলা-কুটিলার উল্লেখ থাকায় বিদ্যাপতির হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বাঙ্গালী কবির লেখা।

'কবিরঞ্জন' ব্যতিত যখন অন্য কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কথা জানা যায় না, সেই হেতু সহজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই দুই পদই কবিরঞ্জনেরই রচনা এবং তাঁহার কবিশেখর উপাধিও ছিল। এ সম্পর্কে বলা যায়, কবিরঞ্জন, কবিশেখর, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বহু পদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই অভিন্ন করিয়া দেখিলে সত্য নির্ণয় করা যায় না। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন—"একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পরস্পরের পরিপূরক দুইটি পদের একটিতে 'কবিশেখর' ভণিতা এবং অপরটিতে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায়।" সেইজন্য তিনি কবিশেখর বিদ্যাপতি বা বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বা কবিরঞ্জনকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। গোবিন্দদাস মৈথিল কবির পদের পরিপূরক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই যুক্তিতে নিশ্চয়ই কবি-পরিচয় লুপ্ত হয় না। একই গুরুর দুই কবি-শিষ্য যদি পরস্পর পরস্পরের ভাবের পরিপূরক পদ রচনা করেন, তবে তাঁহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কেন স্বীকার করা যাইবে না তাহা বুঝা যায় না। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও দুইটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"রামগোপাল লিখেছেন যে কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' ছিলেন। কবিশেখরও 'রাজসেবী' ছিলেন।" সুতরাং তাঁহারা অভিন্ন। দুইজন কবিই যদি রাজসেবী হন, তাহাতে তাঁহাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব কেন ক্ষুন্ন হইবে তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, তিতি 'আনন লোমুঅ বচনে বোলএ হঁসি' [মি-ম—৯৩১] পদটির তিনটি পাঠভেদ দেখাইয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীতে পদটি কবিশেখরের নামে, পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবীর 'কীর্তন পদাবলী'তে কবিরঞ্জন ভণিতায় আছে। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় রাগতরঙ্গিণীতে "ইতি বিদ্যাপতেঃ" বলিয়া উল্লেখ আছে,

তাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদ কবিশেখর ভণিতায় পাওয়া অসম্ভব নয়। রাগতরঙ্গিণীতে যেখানে কবিশেখর ভণিতার সহিত বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে, সেক্ষেত্রে পদকল্পতরুর ভণিতায় বিদ্যাপতি দেখিলে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয় না। সুধীরচন্দ্র রায় এবং অপর্ণা দেবী আকর গ্রন্থের উল্লখ করেন নাই। তাই তাঁহাদের গৃহীত পাঠে গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। আর তাহা ছাড়া, পদাবলীর রাজ্যে বহুক্ষেত্রে একই পদ বিভিন্ন কবির নামে পাওয়া যায়। সেইজন্য এ সকল ক্ষেত্রে এইভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত।

কবিরঞ্জন এবং কবিশেখর স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্ব। কবিশেখর ভণিতার নানা রূপ দেখা যায়। শেখর, রায় শেখব, শেখর রায়, কবিশেখর প্রভৃতি ভণিতায় যেমন বহু পদ দেখা যায়, তেমনি আর একজন গ্রন্থকর্তা কবিশেখরেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি 'গোপালবিজয়' কার কবিশেখর। রামগোপাল দাস রসিক দাসের সহযোগিতায় বসিক-নির্ণয় গ্রন্থে কবিশেখরের উল্লেখ করিয়াছেন। 'রসকল্পবল্লী'তে তিনি কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' হইতে উদ্ধৃতি লইয়াছেন। গোপালবিজয়-কার কবিশেখব এবং পদকর্তা কবিশেখর যদি অভিন্ন না, হইতেন তবে তিনি স্বতন্ত্র উল্লেখ রাখিতেন। শেখর, রায় শেখব, শেখর রায় ও কবিশেখর ভণিতাযুক্ত সকল পদের কবিই একজন কি না' তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে 'রসকল্পবল্লী'তে উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদকর্তা কবিশেখর যে গোপালবিজয় কাব্যের রচনাকার তাহা অসম্ভব নয়। ভাবের ক্ষেত্রে যে সাধর্ম লক্ষ্য করা যায়, তাহা অভিন্নত্বেরই দ্যোতক। গোপালবিজয়ের ভাষার সঙ্গে পদাবলীর ভাষার যে ভিন্নতা, তাহার কারণ পদাবলীর বহমানতা। 'গোপালবিজয়-কার কবিশেখর গ্রন্থে আপনার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন,—

> সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন
> শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন।
> বাপ শ্রীচতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী
> কৃষ্ণ য'র প্রাণধন কুলশীল জাতি।

কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে চতুর্ভুজ ও হীরাবতী। কিন্তু পদাবলীর রাজ্যে যে দুই শতাধিক পদের ভণিতায় কবিশেখর, শেখর, রায়শেখর দেখা যায়, তাহার রচক ইনিই কি না তাহা বলা বড় দুষ্কর। এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেন "বিরুদ্ধে যুক্তি আছে তিন চারিটি। প্রথমত, পদাবলী-রচয়িতা কোন কবিশেখরের আসল নাম যে দৈবকীনন্দন (সিংহ) তাহা কেহই বলেন নাই। একটি প্রাচীন শাখানির্ণয়ে কবির নাম আছে "শ্রীকবিশেখর রায়"। দ্বিতীয়ত, রসিকদাস কবিশেখরকে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়াছেন। তৃতীয়ত, গোপালবিজয়ে চৈতন্যের উল্লেখ নাই, অন্য চৈতন্যভক্তের কথা দূরে থাক। আর চতুর্থত, গোপালবিজয়ে ভণিতায় কবির নামের আগে বা পরে "রায়" মিলে না বলিলেই হয়। এই চারি যুক্তিকে খণ্ডন করা খুব কঠিন নয়। কবি ভুলে একবারও কোথাও নিজের আসল নাম ভণিতায় ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং একশ বা দেড়শ বছর পরেকার পদাবলী-সংগ্রহকার যে ভণিতার নামকেই আসল বলিয়া লইবেন তাহাই স্বাভাবিক। পদকর্তা কবিশেখর যে রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন একথা—রসিক দাসের উল্লেখ বাদ দিলে—প্রমাণসহ নয়। ...যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কবিশেখর রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন তাহা হইলেও গোপালবিজয়ে গুরুর অনুল্লেখ অনুমানের বাধক হয় না। সকলেই যে সর্বত্র গুরুর নাম করেন এমন নয়। রচনার পরে দীক্ষা লইলে গুরুর নাম থাকিবার কথা নয়। গোপালবিজয়ে গুরুর বা চৈতন্যের উল্লেখ না থাকা মারাত্মক নয়। কাব্যটি কৃষ্ণলীলা, তাই কবি অন্য অবতারের নাম করেন নাই। চৈতন্যের উল্লেখ না থাকিলেও গোপাল-বিজয়ের কবি যে চৈতন্যপন্থের পথিক, তাহা বুঝা দুরূহ নয়। "কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি", "বৈষ্ণব চরণরেণু ধরিয়া হৃদয়ে, "নন্দের নন্দনে বিধি কান্দনে না পাই"—এমন কথা ভক্তিরসের মর্ম না বুঝিয়াছেন তাঁহার কলমে কিছুতেই বাহির হইত না।...কবিশেখরের ভণিতায় চৈতন্য-বন্দনা পদ কয়েকটি আছে। সেগুলি সবই যে পরবর্তী কালের রচনা তাহা বলা চলে না।

ভাব ও রচনারীতির দিক দিয়া বিচার করিলে কবিশেখর-শেখর ভণিতার পদগুলিকে অন্ততঃ তিনজন পৃথক কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়। একজন কবিশেখর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি এবং ভালো পদাবলী রচয়ীতা। আর একজন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের সন্ধিকালের কবি। ইঁহাকেই আমবা গোপালবিজয়েব কবি বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ কবিব। আর একজন কবিশেখর বায় (বায় শেখর) সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগের কবি। ইনি শ্রীখণ্ডের শিষ্য হইতে পারেন। তবে শেষ দুইজন একব্যক্তি হওয়া সম্ভব।" সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের এই কবির একটি পদে (তরু ২৬৫১) ডক্টর সেন পর্তুগীস 'আতা' শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছেন। যাহা হউক, একথা স্বীকার কবা যায় যে, কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলিব অন্যতম বচক গোপালবিজয়-কার দৈবকীনন্দন।

বৈষ্ণব পদ-সংকলনের ক্ষেত্রে পথিকৃৎরূপে শ্রীরূপ গোস্বামীর উল্লেখ করা যায়। 'পদ্যাবলী' নামক গ্রন্থে তিনি বহু কবির পদ সঞ্চয়ন করিয়াছেন। প্রখ্যাত বহু পদকর্তার সঙ্গে তিনি শ্রীকবিশেখব, শ্রীসঞ্জয় কবিশেখর এবং শ্রীসঞ্জয়ের পদও গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এই গ্রন্থে শ্রীকবিরত্ন, শ্রীকবিবাজ মিশ্র, শ্রীকবিসার্বভৌম, শ্রীকবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠদেব পদ গ্রহণ করিযাছেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। 'শ্রীকবিশেখরস্য' উল্লেখে মথুরামহিমা বিষরক একটি পদ (১২০-সংখ্যক) গৃহীত হইয়াছে এবং ইহার পবেই শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'শ্রীসঞ্জয় কবিশেখরস্য' নামে দুইটি অপূর্ব পদ (১৬৭, ১৭০) শ্রীরূপ গোস্বামী চয়ন করিয়াছেন। নৌক্রীড়া এবং বসন্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গেও দুইটি পদেও (২৬৮, ২২৩) 'শ্রীসঞ্জয় কবিশেখরে'র উল্লেখ আছে। পরিশিষ্টে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন কবিলে পব সখীব উক্তি পর্যায়ে 'শ্রীসঞ্জয়স্য' একটি পদ (২৪) গৃহীত হইয়াছে। এই ছয়টি পদেব রচকেই যে 'শ্রীসঞ্জয়', যাঁহার উপাধি 'কবিশেখর', তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কবিশেখরের ব্যক্তি-পরিচয় আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই, কিন্তু পদাবলীর রাজ্যে তিনি যে সুপ্রতিষ্ঠিত পদকর্তা, তাহার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ শ্রীরূপ

গোস্বামীর এই অনুরক্তি। কবিশেখর, শেখর, রায়শেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে ইঁহার রচনা যে বহুল পরিমাণেই রহিয়াছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। পদাবলীর মনোধর্ম তথা ভাব-সাদৃশ্য এবং প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে সঞ্জয় কবিশেখরের দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কামতা-কামরূপের রাজা শুক্লধ্বজের পোষকতাপুষ্ট কবিশেখর উপাধি-যুক্ত অপর কবিও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই কবির নাম গোবিন্দ। ইঁনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদকরূপে সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বকৃত পদাবলী ছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

যাহা হউক, কবিশেখর উপাধির আড়ালে দুই-তিনজন বা ততোধিক কবির রচনা যে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে কবিরঞ্জনকে এক করিবার কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ নাই। কবিরঞ্জন যে দ্বিতীয় বিদ্যাপতিরূপে বৈষ্ণব সমাজে বন্দিত, তাহাও অনস্বীকার্য।

।। কবি চম্পতি বিদ্যাপতি ।।

বিদ্যাপতি বিচারে কবি চম্পতির আলোচনা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় 'বিদ্যাপতির উপাধি' শীর্ষক আলোচনায় লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাপতি চম্পতি, কবি চম্পতি প্রভৃতিও বিদ্যাপতির পদবী। উপাধি কি না নির্ণয় করিতে পারা যায় না। "বিদ্যাপতি চম্পই" এইরূপ ভণিতাযুক্ত পদ মিথিলাতেও পাওয়া যায়।" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার সংকলন-গ্রন্থে চম্পতি ভণিতায় মোট পাঁচটি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। চম্পতি ভণিতায় পদকল্পতরুতে মোট ১২টি পদ [৩৬৮, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৫৩১, ৫৩২, ৭২৫, ১৬৫৮, ১৬৬৪, ১৬৭৪, ১৭৪৪, ২০২৫] আছে। গুপ্ত মহোদয় পদকল্পতরুর ৩৬৮, ৪৮০, ৫৩২ ও ৭২৫ সংখ্যক পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কীর্তনানন্দ হইতে চম্পতি ভণিতাযুক্ত 'মাধব দুর্জয় মনিনি মানি' পদটি লইয়াছেন। পদটির ভণিতা—

কবি চম্পতি কহ   রাহি মনাইতে
আপ সিধারহ কান ॥

এই পদটিই বরাহনগরের ২২-সংখ্যক পুথিতে পাইয়াছি। ভণিতা—

চম্পতি নাথ   রাই যাদ মিলব
আপ সিধারহ কান ॥

উপর্যুক্ত পদগুলির ভণিতা বিচার করিলে কবির উল্লেখ নিম্নরূপভাবে পাওয়া যায়।

(ক)   চম্পতি পতি আত   আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে ॥   (তরু ৪৮০)

(খ)   চম্পতি পৈড   কপূর যব না মিলব
তব মীলব হরি সঙ্গে ॥   (তরু ৯৮১)

(গ)   রায় চম্পতি   বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥   (তরু ৫৩১)

(ঘ)   বিদ্যাপাত কবি চম্পতি ভাণ।
রাহ না হেরব তোহারি বয়ান ॥   (তরু ৩৬৮

কবির উল্লেখ কবি চম্পতি, চম্পতি নাথ, চম্পতি পতি, চম্পতি পৈড, রায় চম্পতি নামে দেখা যায়। ইহা ব্যতাত পাঁচথুপীর পুথি হইতে এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। পদটিব [সুন্দরী, কে জানে কেমন মন তোব] ভণিতায় দেখা যায়—

তুয়া সহচরীকত   সুবচনে স ধল
অতয়ে আওলু অছু সাথে।
মোহে উপেখই   তুহু কৈছে জাউান
কহতহি চম্পক নাথে।

লিপিকর প্রমাদে চম্পতিনাথ, চম্পকনাথে পরিণতি লাভ করিয়াছেন।

কবি চম্পতিকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় বিদ্যাপতির সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ, পদকল্পতরু ৩৬৮-সংখ্যক পদের ভণিতায় 'বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ' দেখিয়াই

তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই উল্লেখে যেমন বিদ্যাপতি ও চম্পতিকে অভিন্নরূপে অনুমান করা যায়, তেমনি চম্পতি কবির উপাধি যে বিদ্যাপতি ছিল না তাহাও বলা যায় না। বিদ্যাপতি ও কবি চম্পতিকে অভিন্ন ধরিবার পক্ষে যে অন্তরায় আছে, সেগুলির বিচার করা প্রয়োজন। নেপাল এবং রামভদ্রপুরের পুথিতে এ পর্যন্ত চম্পতি ভণিতাযুক্ত একটি পদও পাওয়া যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ পুথিদ্বয়ে বিদ্যাপতি এবং চম্পতির যুক্ত-ভণিতাও কোন পদে পাওয়া যায় নাই। লোচনের রাগতরঙ্গিণী সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব বিদ্যাপতি এবং চম্পতির অভিন্নত্ব সম্পর্কে সহজেই সন্দেহ দেখা দেয়। বিশেষ করিয়া এই কবি সম্পর্কে রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রে 'চরণপ্রিয়জন রায় চম্পতি রচই ভাবিনি সাথ' [তরু ২০১৫] এবং 'চম্পতি পতি বিনু তনু ভেল শেষ' [তরু ১৬৭৪] পদদ্বয়ের ভণিতায় পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রঃ চম্পতি-রায় নামা মহাভাগবত আসীৎ স এব গীতকর্তা" [পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ১৯৮] "চম্পতিরায়নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ স এব গীতকর্তা।" [পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ২৯২]

ইহা হইতে জানা যায়, উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র ছিলেন গীতকর্তা রায় চম্পতি। অতএব রায় চম্পতি যে বিদ্যাপতি নহেন, তাহা বলা যাইতে পারে। " 'চম্পতি' শব্দ 'চমূপতি' হইতে আসিয়াছে। 'চমূপতি' অর্থ সেনাপতি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় 'চম্পতি' বিদ্যাপতির পদবী হইতে পারে লিখিয়াছেন। বাংলা দেশে 'চম্পটি' পদবী প্রচলিত আছে। 'চম্পটি' বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি, গাঞি, নাম এবং ইহা আসিয়াছে গ্রামের নাম হইতে—প্রাচীন হিন্দু আমলের তাম্রশাসনে এই গ্রামের নাম 'চম্পাহিট্টী' রূপে পাওয়া যায়। [সা. প. প. ১৩৩৬]" বিদ্যাপতির পদবী ছিল ঠাকুর' বা 'ঠক্কুর'। 'চম্পটি' পদবী বিদ্যাপতির ছিল না, এ-কথা অনস্বীকার্য। রাধামোহন ঠাকুরকে অনুসরণ করিয়া কবির নাম হিসাবেই 'চম্পতি' গ্রহণ করা যায় এবং 'চমূপতি' হইতে

'চম্পতি' শব্দের প্রয়োগ ধরিয়া কবি চম্পতির উল্লেখ দেখাইয়াছেন ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' নামক প্রবন্ধে [বিচিত্র নিবন্ধ, পৃঃ ৯৪—৯৬]। তিনি লিখিয়াছেন—"পদাবলীতে শ্রীরূপ গোস্বামী দক্ষিণ দেশবাসী কোন কবির রচিত ['দাক্ষিণাত্যাস্য'] বলিয়া পাঁচটি শ্লোক তুলিয়াছেন।* [শ্লোকসংখ্যা ৮, ৫০, ৭০, ১১৫, ২৮২] তাহার মধ্যে একটি শ্লোকে 'চমূপতি' কথাটি আছে, এবং সেই স্থলে ঐ কথাটি কবির নাম বলিয়া ধরিয়া লইলে বেশ সঙ্গত অর্থ হয়। সে শ্লোকটি এই,

অথ ভক্ত বাৎসল্যম্।

অতন্দ্রিত-চমূপতি-প্রহিতহস্তমস্বীকৃত-
প্রণীত-মণিপাদুকং কিমপি বিস্মৃতাস্তঃ পুরম্।
আবাহনপরিক্রিয়ং পতগরাজমারোহতঃ
করিপ্রবর-বৃংহিতে ভগবতস্ত্বরায়ৈ নমঃ॥ ৫০ [শ্রীদাক্ষিণাত্যাস্য]

দাক্ষিণাত্যের এই পদকর্তা চম্পতিকে উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করিলে [রামমোহন ঠাকুরের সূত্র অনুসারে], কবি যে অন্যভাবে পদমধ্যে আপনাকে উপস্থিত করিয়াছেন তাহার যথার্থ কারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাব। শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ার সম্ভাবনাও এই কবির সমধিক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় কবির এই পরিচয় [উৎকলবাসী হিসাবে] গ্রহণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে [পৃঃ ৪০৫] লিখিয়াছেন…"কিন্তু কোন উৎকলবাসী যে "মাথুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে" পদ লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। গোবিন্দদাস বল্লভ, রায় বসন্ত, হরিনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, রায় সন্তোষ, রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ প্রভৃতি যে সকল লোকের নাম পদের ভণিতায় করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই কবির সমসাময়িক। একমাত্র বিদ্যাপতির নাম পূর্ববর্তী কবির। চম্পতি এমন কিছু খ্যাতিসম্পন্ন কবি নহেন যে, গোবিন্দদাস

---

* শ্রীবনমালী দাস শাস্ত্রী সম্পাদিত শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে (বৃন্দাবন, ১৩৫৩) 'দাক্ষিণাত্যাস্য' উল্লেখে ছয়টি শ্লোক (৫, ৫০, ৫২, ৭০, ১১৪, ২৯৯) আছে।

তাঁহার পদের ভাব পূরণ করিবার জন্য প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িকের নাম করিবেন। চম্পতির 'কি করব জপতপ' পদে অবশ্য 'পৈড়' শব্দ পাওয়া যায় এবং রাধামোহন ঠাকুর উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ওড়িয়ারা কাঁচা নারিকেলকে 'পৈড়' বলে। কিন্তু গোবিন্দদাসের সময়ে মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়া শব্দের প্রচুর প্রচলন ছিল। ঐ জেলায় শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের অনেক শিষ্য ছিলেন এবং রসিকমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবি বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের সমসাময়িক এইরূপ কোন কবির নামই চম্পতি রায় ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনিও বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখিতেন।" ডক্টর মজুমদারের উপর্যুক্ত মতবাদ ও তাহার বিশ্লেষণের ধারা সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমতঃ, 'মাথুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে' বলিয়া যে পদটির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পদকল্পতরুর ১৬৭৭-সংখ্যক পদ। যাহার প্রথম ছত্র 'মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাঁচথুপী পুথির ১৬৫৪-সংখ্যক ও পদকল্পতরুর এই পাঠ অভিন্ন।[১] পদটি খাঁটি বাংলা সন্দেহ নাই। চম্পতির 'পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন' [তরু ৭২৫[২]] পদটিও মিশ্র বাংলায় রচিত। অপর পদগুলি খাঁটি ব্রজবুলিতে। ওড়িয়া কবির পক্ষে বাংলা কিংবা ব্রজবুলিতে পদ রচনা অসম্ভব একথা মনে করা যায় না, বিশেষতঃ যেখানে রায় রামানন্দের 'পহিলহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল' পদটি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষরূপে আদৃত। দ্বিতীয়তঃ, রায় চম্পতিকে আমার গোবিন্দদাসের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। চম্পতি বহুখ্যাত কবি ছিলেন না সত্য, কিন্তু গোবিন্দদাস যে স্বল্পখ্যাত কবিদের নাম পদের ভণিতায় যুক্ত করিয়াছেন, সে দৃষ্টান্তও একেবারে নাই বলা চলে না। ইহা ব্যতীত ডক্টর মজুমদারের 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থের পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মন্তব্যটির প্রতি আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি।

---

১ সম্ভবতঃ ডক্টর মজুমদার পদামৃতসমুদ্রের পাঠে (২৯২) বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

২ ক. বি. ৬২০৪, পৃঃ ৪৪৪ (চম্পতিনাথ)।

"শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ দুইটি পদের ভণিতায় প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ করিয়া পরে ঐ স্থানে রায় চম্পতি ও' রায় বসন্তের নাম বসাইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তিনি রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন [পৃঃ ৩]।"

এই দিক হইতে বিচার করিলে চম্পতির উল্লেখ সঙ্গত মনে হইবে। ইহা ছাড়া, গোবিন্দদাস পদ-রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশীর কালে চৈতন্য পার্ষদমণ্ডলীভুক্ত এই কবির পদ বিদ্যাপতির পদের মতই পূরণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। তৃতীয়তঃ, 'পৈড়' শব্দের উল্লেখ করিয়া ডক্টর মজুমদার কবিকে উৎকলবাসী না বলিয়া মেদিনীপুরের কবি বলিতে চাহিয়াছেন। 'পৈড়' শব্দ মেদিনীপুরে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ওড়িয়া শব্দ। সেক্ষেত্রে নিতান্ত এই একটি শব্দকে অবলম্বন করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অমাত্য এই কবিকে মেদিনীপুরের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সঙ্গত নয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর চমূপতি এবং প্রতাপরুদ্রের চম্পতি যদি অভিন্ন হন, তবে দাক্ষিণাত্যের বলিয়া উল্লিখিত এই কবিকে বঙ্গদেশের বলিয়া গ্রহণ করার স্বপক্ষে যুক্তি থাকে না।

যাহাই হউক, এ পর্যন্ত কবির অস্তিত্ব বিশ্লেষণ এবং তাঁহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা গেল। চম্পতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিচার করিলে আর একটি সমস্যা দেখা দেয়। চম্পতির কয়েকটি পদ ভূপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। নিম্নে পদগুলির উল্লেখ করা গেল।

১। 'অখিল লোচনতম তাপ বিমোচন'। চম্পতি ভণিতা—সমুদ্র ১৯২, সং ৪০২, তরু ৪৮০ ; ভূপতি ভণিতা—বরাহ ৩১, ক. বি. ৪৫৪৯ (৪), সা. প. ২৪৩৩ (৩) ; তরু-র প-র-সা. পাঠ।

২। 'সুন্দরী কাহে কহসি কটুভাষা'। চম্পতি ভণিতা—সমুদ্র ১৯৩, সং ৪০৩, তরু ৪৮১ ; ভূপতি ভণিতা—পাঁচথুপী ৬৭৯, বরাহ ৩১, ক. বি. ৪৫৪৯ (৬) ; তরু-র প-র-সা. পাঠ।

৩। 'রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী'। চম্পতি ভণিতা—তরু ৪৮২ ; ভূপতি ভণিতা—ক. বি. ২৩৯৩, ৪৫৮৯ (৭), বরাহ ৩১, ২৬-ক (২১)।

চম্পতি ভণিতায় ১৩টি পদ [১২টি তরুতে, ১টি বরাহ ২২ পুথি এবং সং. গ. ৪০১] পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উপর্যুক্ত তিনটি পদ ভূপতি ভণিতায়ও পাওয়া যায়। অনেকে চম্পতি ও ভূপতিকে এই কারণে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু এই তিনটি পদের বাহিরে আরও ১০টি পদ ভূপতি ভণিতায় পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই তিনটি পদই 'দুর্জয় মান' প্রসঙ্গে গৃহীত। সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের ১০৬০ সালের পুথি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৭০ সালের ৪৫৪৯-সংখ্যক পুথিতে দুর্জয় মান বিষয়ে ক্রমানুযায়ী সাতটি পদই ভূপতি ভণিতায় পাওয়া যায়। এই কারণে দুর্জয় মানের সাতটি পদকেই ভূপতি কবির রচিত বলিয়া অনুমান করা চলে। কবি ভূপতি ভণিতায় পদকল্পতরুতে ১৩টি পদ আছে। ইহা ব্যতীত আরও ৯টি নূতন পদ ভূপতি ভণিতায় আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সেই পদগুলিতে ভূপতির স্থলে চম্পতির প্রয়োগ কোথাও নাই। সুতরাং, চম্পতি ও ভূপতিকে অভিন্ন কবি হিসাবে গ্রহণ না করিয়া উপর্যুক্ত তিনটি দুর্জয় মানের পদকে ভূপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন বিরোধ থাকে না। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ভূপতি সম্পর্কে বিশদ্ আলোচনা করিয়াছি।

॥ কবি ভূপতি বিদ্যাপতি ॥

'ভূপতি', 'কবি ভূপতি', 'সিংহ ভূপতি', 'ভূপতি নাথ', 'ভূপতিকণ্ঠহার' প্রভৃতি ভণিতায় পদকল্পতরুতে ১৩টি পদ পাওয়া যায় [১১৪, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৮, ৫৩৯, ১০৮০, ১৬৯৮, ১৭২৬, ১৭৩৬, ১৮৭৮, ১৯৮৩]। তন্মধ্যে সিংহ ভূপতি নামে ৬টি, ভূপতি নামে ৪টি, ভূপতি নাথ নামে ২টি এবং নৃপতি সিংহ কবি ভণিতায় ১টি পদ দেখা যায়। এই পদসমূহের মধ্যে ভূপতি ভণিতায় ৪টি [ন. গ. ৩৮০, ৫৩৬, ৭৫৮, ৭৬১], ভূপতি নাথ ভণিতার ২টি [৩৭৫, ৪১৯] এবং সিংহ ভূপতি ভণিতায় ৩টি [৩৭৮, ৫৯১, ৮১৫] পদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় বিদ্যাপতির পদ বলিয়া তাঁহার সংকলন-গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। ভণিতায় ভূপতির সঙ্গে শিবসিংহ নাম যুক্ত করিয়া ভূপতিকে বিদ্যাপতিরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা

করা হইয়াছে। ভণিতার বিচার এই আলোচনার শেষাংশে করা হইয়াছে। যাহাই হউক, গুপ্ত মহোদয় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—(১) "ভূপতিনাথ অথবা ভূপতি সিংহ ভণিতাযুক্ত পদ বিদ্যাপতির রচনা" [পৃঃ ২২৯]। (২) "সিংহ ভূপতি ভণিতাযুক্ত সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত। সিংহ ভূপতি—শিবসিংহ" [পৃঃ ২৩১]। বিদ্যাপতি স্বীয় অন্নদাতার নাম পদমধ্যে বিনয়বশতঃ বসাইয়াছেন, ইহাই গুপ্ত মহোদযের যুক্তি। তিনি ভূপতি ভণিতার পদসমূহকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কিজন্য ভূপতি ভণিতার অপর তিনটি পদ গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ তিনি নির্দেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ, এই তিনটি পদের আভ্যন্তরীণ বিচারে বিদ্যাপতির বলিতে তিনিও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এই তিনটি পদের প্রথম চরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	সকল সখী পরবোধি কামিনী	তরু ১১৪
২।	অসনি কহতহিঁ তসনি পয়েহসি	তরু ১৬৯৮
৩।	ঘোর বন বন ঘোর শুনত	তরু ১৭৩৬

ইহা ব্যতীত, ভূপতিকণ্ঠহার ভণিতাযুক্ত 'বিবহ ব্যাকুল বকুল তরুমূলে' [তরু ৪৮৮] পদটিও তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহা ক. বি. ৬২০৪ ও ৪৪৭ পুথি ও পদকল্পতরুর ভণিতার সহিত অভিন্ন। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে পদটির 'সুকবি কণ্ঠহার' ভণিতা আছে। পদরসসার গ্রন্থেও 'সুকবি কণ্ঠহার' ভণিতায় ধৃত। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে 'সিংহ ভূপতি' ভণিতায় বিদ্যাপতির 'সন্দিগ্ধ পদ' পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। গুপ্ত মহোদয়ের সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই পালন করেন নাই। ভূপতি ভণিতাযুক্ত সকল পদ নির্বিচারে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দুর্জয় মান প্রসঙ্গে চম্পতি ভণিতার তিনটি পদে [তরু ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২] ভূপতি ভণিতা দেখিয়া তিনি চম্পতি এবং ভূপতিকে অভিন্ন মনে করিতে চাহিয়াছেন। এই তিনটি পদের ভণিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ডক্টর সুকুমার সেনও অনুমান করিতে চাহিয়াছেন, "চম্পতি আর ভূপতি সম্ভবতঃ একই ব্যক্তির উপাধি বা পদবী।" [বিচিত্র নিবন্ধ, পৃঃ ৯৬] এবং এই প্রসঙ্গে ডক্টর সেন আরও একটি জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়াছেন,—

"চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে মূল স্কন্ধশাখা বর্ণনার মধ্যে এক উড়িষ্যাবাসী সিংহেশ্বরের নাম আছে।

রামভদ্রাচার্য আর ওড্র সিংহেশ্বর
তপন আচার্য আর রঘুনীলাম্বর।

এই সিংহেশ্বরই কি 'সিংহভূপতি' বা 'রায়-চম্পতি' "?

এই উদ্ধৃতি হইতে সিংহেশ্বর বা সিংহভূপতির সহিত রায়-চম্পতিকে কিভাবে অভিন্ন কল্পনা করা চলে, তাহা বুঝা যায় না। তবে এই সিংহেশ্বরই সিংহভূপতি কি না, তাহা বিচার্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভণিতায় সিংহভূপতি কোথাও সিংহেশ্বররূপে দেখা দেন নাই। কিংবা শ্রীচৈতন্যের পরিকরবৃন্দের সহিত বা উড়িষ্যারাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোন সংবাদ ভূপতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত জানা যায় নাই। আর ভণিতা বিচার করিলে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তিনি আর যাহাই হউন, উড়িষ্যারাজ নহেন,—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেইজন্য চম্পতি ও ভূপতিকে অভিন্ন অনুমান করা কিংবা 'ওড্র সিংহেশ্বর'কে কবি ভূপতিরূপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ কোন যুক্তি দেখি না।

প্রাচীন সংকলন-গ্রন্থসমূহে ভূপতি ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে 'সিংঘ ভূপতি' ভণিতায় 'সকল সখী পরবোধি কামিনী' [রাগ পৃঃ ৭৪-৭৫, ন. গ. ১৭৫, মি.-ম. ২৭৩] এবং 'গৌর দেহ সুধারস সুবদনি' [রাগ পৃঃ ৬০, ন. গ. ৫৯১] পদ দুইটি পাওয়া যায়। রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লীতে [১৫৯৫ শকাব্দ, ১৬৭৩ খ্রীঃ] 'সিংঘ ভূপতি'-র রচনা বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র পাওয়া যায়—

শ্যাম সুন্দর সুগড় শেখর আজু কোলে মোর মিলব রে।
আপন অন্তর বড়ই হরিষ সখি নিশ্চয় কহিল তোরে॥

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ (১৯৬৩), পৃঃ ১৫২]

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে রাগ-তরঙ্গিণীর 'গৌর দেহ সুধারস সুবদনি' পদটি গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন পদ-সংকলন-কর্তাগণ কেহই 'সিংহভূপতি'কে চম্পতি ও বিদ্যাপতির সহিত অভিন্ন করিয়া দেখেন নাই। পদকল্পতরুতে সিংহভূপতি, ভূপতি

এবং ভূপতিনাথ নামে [যথাক্রমে ৬+৪+২=] ১২টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এ পর্যন্ত ভূপতি ভণিতায় আর কোন পদ পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে এই পদগুলি ছাড়া আরও নূতন ৯টি পদ ভূপতি ভণিতায় আমি সংগ্রহ করিয়াছি। এই পদগুলিসহ বিরহ ও মান পর্যায়ের যথাক্রমে ১টি ও ৩টি পদও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১

তুয়া বচনে হাম কুঞ্জে পয়ান।
রতি রস লাগি সেজব নয়ান॥
সখিগণ সঙ্গে তুয়া পথ চাঙ।
তুহুঁ ইহ রজনী রহলি কো ঠাম॥
অবতাঁহা দূরিতে করহ পয়ান।
কোন কাজ ইহা শুনতিক কান॥
ইহ অঙ্গ বিবশ দেখহি তোর।
অন্তর রহু জনতছি মোর॥
মোহে কৈতব করি গেও আর ঠাম।
হাম তুয়া বিনু নাহি জান আন॥
আছু নিশি গেল হঠ না কররি।
ভূপতি বচন হৃদয়ে তুহুঁ ধররি॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ সংখ্যা ৮৫, পত্রাঙ্ক ১০)

২

ললিত রাগ

তুহুঁ সুমতি নাহি ভেলা।
নিজ মন্দিরে চলি গেলা॥
চলিতে অবশ তুহুঁ দেহা।
অথর নাহিক সন্দেহা॥
সখী লেই সুন্দরী রাধা।
গেহ চলহি কত বাধা॥
সখীগণ মিলল ধামা।
ভূপতি ইহ রস গামা॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ৮৬, পত্রাঙ্ক ১০-১১)

[সখীর প্রতি সখীর উক্তি]

৩

জয়ন্তী

কামিনী যামিনী কাহিনী গেল।
চির সমাগত হরি ভেল আগত
আধহি কেলি না ভেল॥
অধরক রাগ দশনে না মেটল
পালটিয়া গাথনি হারা।
গৌন কি করহ ধনি তুহুঁ এ অচেতনি
কিয়ে তুয়া নাহ গোঙারা॥
আপদ অতএ সো নাহি মিলায়ল
ঝামর ভৈ গেল দেহা।
যপন বঞ্চ ধন জনু খণ্ডন
হরি গেল সিন্দুরহা॥
তরু কুল পুলক খগমৃগ সচকিত
সুর নর হর কিন্নর হরি তোরি।
ভূপতি মুরছি তল দশদি পুরি তন্নিত
কুলবতী ব্রত কোরি চোরি॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ৮৭, পত্রাঙ্ক ১১)

[রসোদ্গার পর্যায়ে রাধার প্রতি সখীর উক্তি। এই পদটির সঙ্গে বিদ্যাপতির 'কপট করহ কথি লাগি' পদটির ভাবের ঐক্য দেখা যায়।]

৪

ধানশী

বহুদিনে রে সখি জানি ভালে হাম।
ঐছন কানুক পিরীতি পরিণাম॥
পহিলহি চাঁদ কানা দিল আনি।
ঝাঁপল শেল শিথির এক পানি॥
এ সখি এ সখি না বোল আন।
ধিক ধিক মোহে না রহে পরান॥

অন্তর বাহির সমনহ চিত।
পানি তৈল জনু নিবিড পিরিত॥
কৈতব প্রেমক বড়ই আবাজ।
ভূপতি ভণ শুন শিবসিংহ রাজ॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ১৪৩, পত্রাঙ্ক ১৬)

৫

আশাবরী

সুন্দরী স্বপনে পেখলা।
সুরতিক রস কহলা॥
তুহারি কাহিনী কহল সো ধনি
অচেতন ভই রহলা॥

মাধব শুনহ বচন মোরা।
কুল খোয়াওলি থেরা॥
থির না হোই পরবশ গোই
কুচযুগ চারু চকোরা॥

সো ধনি চম্পক বরণা।
জনু সে তপত কাঞ্চনা॥
চলিয়া যাইতে রূপ নিরখল
ভাঙ ভাঙ্গ বান দহনা॥

তোহারি নয়ন বাণে।
বধনি তাক পরাণে॥
ইহ দুখ সহই ভূপতি কহই
লছিমা ইহ রসগানে॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ২৮, পত্রাঙ্ক ৪)

[কৃষ্ণের প্রতি আপ্তদূতী সখীর উক্তি।]

৬

অনুমতি লেই তুঁহারি হাম এহ।
কণ্টক ডারি খোয়াঅলু নেহ॥
কাঁহা না পেখলুঁ জগতে হেন রীতি।
প্রাণ খোয়াওলি লাগি পিরিতি॥
নরপতি নয়নে গলয়ে অশ্রুধার।
অদ্ভুত প্রেম পিরিতি দুহুঁকার॥
আপনি চোর কহলি উপদেশই।
প্রেম ভোলে দেহ লেহ নাশাই॥
কাহে নাহি ইঙ্গিতে কহলি মোয়।
কান্ধে করি ধনি মিলাইও তোয়॥
না কহসি ভূপতি ও পরসঙ্গ।
চোর রমণী বিনে নহে রস রঙ্গ॥
গোপত পিরিতি রস কত না হোয়ে।
ছুটল প্রেম পরাণ দুহুঁ খোয়ে॥
তবহুঁ পিরিতি রসে দুহুঁ তনু এক।
দুহুঁ অরু মঙ্গল ভেল মরণ বিবেক॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভূপতিক সাঁথ।
লিখহ লছিমা দেবী উপপতি সহপাত॥

[নিজস্ব পুথি (১২০০ সাল)]

৭

ভৈরবী

দেখ নাগরী বেশ বনায়ত কান।
পদপর মঞ্জীর চেতনে পরান॥
কটিপর কিঙ্কিনী অম্বর মাঝ।
কনকহুঁ বসন তাহি পরিসাজ॥
কণ্টক মোতিম গাঁথনি হার।
হৃদয় চঢ়ায়ল বহু পরকার॥
বিথরল কুণ্ডল কণ্টক পাশ।
হরিষে সাজাই লছ লছ হাস॥

নিজ করে রাধা কাজর লেল।
রাইক যুগল লোচনহি দেল॥
ভাল পরি দেয়ল সিন্দূর বিন্দু।
কঞ্চুক পয়োধরে মৃগমদ বিন্দু॥
কঙ্কণ করপর অপরূপ সাজ।
বহুরূপে সাজায়ল সুরতিরাজ॥
ভূপতি ইহমতি অবিরত গান।
লছিমাক বেদন নরপতি জান॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ১৩, পত্রাঙ্ক ৯)

৮

গোপত পিরিতি রস বেকত হোই।
টুটত ইহলোক পরাণ দুহে খোই॥
তবহু পিরিতি দোঁহাক তনু এক।
মঙ্গল দেয়ত মরণ বিরহেক॥
ভণএ বিদ্যাপতি ভূপতিক সাথ।
লিখয়ে লছিমা উপপতি পাত॥ (ক. বি. ২৩৮৩)

৯

তিরোতিয়া

কেমহ এক অপরাধ মাধব পালটি হের তাই।
তুয়া বিনে যদি অমিয়া পিরীতি তে না জীবতি রাই॥ ধ্রু॥
পহিলে তোহারি প্রেম গৌরবে গরবে বাউরি ভেল।
অধিক আদর লোভে লুবধিনী চুকলি তেঁ রতি কেল॥
কালি পরসু মধুর যাচনি অবহু ভেলহি চিত।
নোগহ বোলব পুরুখ নিরদয় হঠহ তেজল পিরীতি॥
তুহু যব অব তোহে তেজব এ অতি কোন বড়াই।
তুয়া বিনে নব জীবন তেজব সে বধ নাগর কায়॥
এড় এক অপরাধ কেমহ রাজ পণ্ডিত জান।
রমণী রাধা রসিক যদুপতি সিংহ ভূপতি ভান॥ (কী অপ্র ১৬১)

১০

গান্ধার

সো যমুনা বন কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হরি কি মাথুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শূকে।
ধেনু ছুটল মথুরা মুখে॥
সায়রে তেজব পরাণ।
আর জনমে হোয়ব কান॥
কানু যব হোয়ব রাধা।
তবহি পূরব মন সাধা॥
ভূপতি ইহ দুখ জান।
প্রেমক ইহ সে নিদান॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ১০৩, পত্রাঙ্ক ১২ ;
তরু ১৬৩৮, মি.-ম. ৯১৯)

[মাথুর পর্যায়ের পদ। সখীর প্রতি রাধার উক্তি।]

১১

বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকী হঠ নাহি মান॥
ও ধনি পদমিনী সহজহি ছোর।
করে ধরইতে কত করুলহি কোর॥
নয়নে ঝরয়ে নীর নহি নহি বোল।
ভুখল পাওয়ল জনু দুখ কটোর॥
ভূপতি ইহ রস তোর॥

(বরাহনগর পুঁথি ২২ : পদ-সংখ্যা ৬১, পত্রাঙ্ক ৮)

১২

পটমঞ্জরী রাগ ; চন্দ্রশেখর তাল

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ।
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥

তাহি যেটি কেহ উন শুনাব।
বদন সেচই কেহ জল লেই ধাব ॥
কি করব মাধব শুতল মুখী।
যতনে জিতায়ল সকল সখী ॥ ধ্রু ॥
কাহুক নলিনী কাহুক চন্দনা।
কেহ কহে আওল নন্দন নন্দনা ॥
সরস মৃণাল ছাঁদয়ে ধরে কোই।
চাঁদকি বলে কেহ রহই গোই ॥
কেহ মলয়ানিল তাবই চীরে।
কহু করই নব কিশলয় দূরে ॥
মধ্যাক ধ্বনি শুনি কেহ মূদে কান।
করতল তালে কেহ কুকিল কুজান ॥
কান্ত দিয়ল তুহি কোন কান যাথ।
কেহো কেহো হরি তুয়া গুণ চায় সাথ ॥
বীর নারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয় নারায়ণ ইহ রসগান ॥

(সমুদ্র ৩৫১, তরু ১৯৪৪, ক. বি. ৬২০৪, পদ ২৮৪৩)

১৩

প্রথমই দূতি পঠায়লি আখি।
দোয়জহিঁ মন্দ হাসি ভেল সাখি ॥ ধ্রু ॥
তেয়জহি পূরল পুলকিত দেহ।
বঙ্ক নয়নে হরি বুঝায়ে সেহ ॥
কামিনী কোরে পরসায়ল হাথ।
পুন পুন কেশ উতারয়ে মাথ ॥
তাহে জানল হোঁ নিশি আন্ধিয়ার।
আপন কাহ্ন করব অভিসার ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
সিংহ ভূপতি লছিমা পরমান ॥

(পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি, পদ ১০৪ ; মিত্র-মজুমদার ৮৭)

এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত প্রথম নয়টি পদের ভণিতা বিচার করিলে সর্বত্রই 'ভূপতি'র উল্লেখ দেখা যায়। তিনটি পদের ভণিতায় শুধুই 'ভূপতি'। পরবর্তী পাঁচটি পদের ভণিতায় কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ পদের ভণিতায় 'ভূপতি ভণ শুন শিবসিংহ রাজ' লক্ষণীয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম পদে লছিমা দেবীর উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ পদে লক্ষণীয়, 'ভণয়ে বিদ্যাপতি ভূপতিক সাঁথ। সিংহ লছিমা দেবী উপপতি সহপাত॥' শেষোক্ত তিনটি পদের ভণিতার মধ্যে প্রথম [১১-সংখ্যক] পদের ভণিতায় কোন জটিলতা নাই। কিন্তু এই পদটিই 'ও ধনি পদুমিনী সহজই ছোটি'-রূপে পদকল্পতরুতে [৬৬], ক্ষণদায় [পৃঃ ৫৭], পদামৃতসমুদ্রে [পৃঃ ৪৪], কীর্তনানন্দে [২৯৭] এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংস্করণে [১৫৮] বিদ্যাপতি ভণিতায় আছে। আলোচ্য পদটিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রদ্বয় নূতন। বিদ্যাপতির পদও যে ভূপতি ভণিতায় আসিয়াছে, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। তবে লক্ষণীয় যে, সে প্রায় সম্পূর্ণ বেশ বদল করিয়া আসিয়াছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দশম-সংখ্যক পদটি। ইহারও প্রথম দুইটি ছত্র নূতন। তরুর পাঠান্তরে ইহা গোবিন্দদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যায়। পরকীয়া প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়াই প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী কবি ভূপতি চতুর্থ পদে শিবসিংহের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ-সংখ্যক পদটি পদকল্পতরুতে 'নরনারায়ণ' রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পদটির ভণিতায় পদকল্পতরুতে [১৯৪৪] দেখি,---

নবনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয় নারায়ণ ইহ রস জান॥

আলোচ্য পুথি অনুযায়ী পদকল্পতরুর 'নরনারায়ণ' স্থলে 'বীর নারায়ণ' দেখা যায়। ইহা ব্যতীত 'বিজয় নারায়ণ'-এর উল্লেখ উভয় পুথিতেই আছে। পদকল্পতরুর পাঠান্তরে 'নরনারায়ণ' স্থলে 'শিব নারায়ণ' আছে। কবিরাজ গোবিন্দদাস একটি পদে [তরু ২৪২০] ভূপতির উল্লেখ করিয়াছেন—

গোবিন্দদাস ভণ রসিকরসায়ণ।
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥

এই 'নরনারায়ণ ভূপতি' এবং 'ভূপতি রূপনারায়ণ' অভিন্ন ব্যক্তি কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রসঙ্গতঃ, গোবিন্দদাসের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাটিও উল্লেখযোগ্য।

রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান। (তরু ২৪১৬)

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার নশিপুরের রাজা 'নৃসিংহ গজপতির উপনাম ছিল রূপনারায়ণ'। এই 'নৃসিংহ'-ই পদকর্তা 'নৃপ সিংঘ'তে রূপান্তরিত হইয়াছেন কি না বলা যায় না ["এহনি রমনি নৃপ সিংঘ কহ। হরি হি নিকটে পৈঁ সোভ॥" রাগতরঙ্গিণী]। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই প্রসঙ্গে অনুমান করিয়াছেন 'সম্ভবত সিংহ ভূপতি ও নৃপ সিংহ অভিন্ন'। এ সম্পর্কে সকল তথ্যই অনুমান-নির্ভর। তবে এ-কথা সহজেই প্রতীয়মান যে, ভূপতি ভণিতা-যুক্ত পদগুলি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত নয়, এগুলি কোন বাঙ্গালী কবিরই রচনা।

ভূপতি বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার পূর্বে বৈষ্ণব সাহিত্যের আর এক 'স্বরূপ ভূপতি'র সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মুক্তাচরিত্র [পৃঃ ১—৬৬ সম্পূর্ণ] নামক এক অনতিবৃহৎ কাব্যের [সা. প. পুথি ২২৬৮] উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভণিতায় তিনি লিখিয়াছেন,—

(ক) স্বরূপ ভূপতি কয় মুকুতা চরিত।
শুনহ বৈষ্ণবগণ মজাইয়া চিত॥

(খ) শ্রীচৈতন্যনামধনে যেবা করে স্বপনে
তার পায়ে কোটি প্রণতি।
দীনহীন জড়তম পাষণ্ড দুর্ভাগাধম
বিনয় করে স্বরূপ-ভূপতি॥

ইহার রচিত কোন পদাবলী এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

॥ নৃপতি সিংহ বিদ্যাপতি ॥

নৃপতি সিংহ বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতির সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন 'নদী বহে নয়নক নীর' পদটিতে। নেপাল পুথিতে [পৃঃ ২৩-ক] পদটি নিম্নরূপ পাওয়া যায়।—

নদী বহ নয়নক নীর।
পললি বহএ তাহি তীর ॥
সব খন ভরম গেআন।
আন পুছিঅ কহ আন ॥
মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি।
চৌদসি চান্দ হুঁ চাহি ॥
কেও সখি রহলি উপেখি।
কেও সির ধুনি ধনি দেখি ॥
কেও কর সাসক আস।
ময়ঁ ধউলিহু তুঅ পাস ॥
বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত শুনি সারঙ্গ পানি ॥
হরষি চলল হরি গেহ।
সুমরিএ পুরুব সিনেহ ॥

বিদ্যাপতির এই পদটি আশ্রয় করিয়া পরবর্তী কালের কবি প্রায় স্বতন্ত্র পদ [ভাব এবং ভাষার দিক হইতে] রচনা করিয়া বিদ্যাপতির নামে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে [পৃঃ ৩৪৯-৫০] এই পদটি নিম্নরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।—

নদী বহে নয়নক নীরে।
মূরছি পড়ল তছু তীরে ॥
মাধব ! তোঁহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোঁহে নাহি তিরিবধ-শঙ্কা ॥ ধ্রু ॥
তৈখনে খিণ ভেল শ্বাসা।
কোই নলিনি দলে করয়ে বাতাসা ॥
চৌদশী চান্দসমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ ॥

কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখী পরীখই শ্বাস।
হাম ধায়লু তুয়া পাশ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মনে গুণি পূবর সনেহ॥
নৃপতি শিবসিংহ কবি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান॥

পদটির ব্যাখ্যায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ইত্যুক্তং নৃপতি সিংহস্য কবিঃ বিদ্যাপতিঃ।" বাঙ্গালী কবি আপনাকে ঢাকিবার জন্য শিবসিংহের নাম সংযুক্ত করিয়া নিজেকে চিবতরে গোপন করিতে চাহিয়াছেন। পদকল্পতরুর পাঠে ভণিতায শিবসিংহের উল্লেখ নাই। পদকল্পতরুর ভণিতায় নিম্নরূপ পাঠের সঙ্গে ক বি ৩৩১ এবং ৩৪২ পুথির ৫৪২-সংখ্যক পদ ও পাঁচথুপীর পুথির ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১৬৪৮-সংখ্যক এই পদেব ভণিতার মিল আছে।

নৃপতি সিংহ কবি ভাণ।
মনে গুনি বুঝহ সেয়ান॥

বিদ্যাপতির মূল পদটিব এই রূপান্তর সম্পর্কে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থ ই লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতির পদটি শুধু বাংলা ভাষায় নহে, বৈষ্ণব ভাবেও পরিবর্তিত করিয়া 'নৃপতি সিংহ' ভণিতায় পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে। নেপালের পুথিতে আছে যে, হরি পূর্বস্নেহ স্মরণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাংলা দেশের গৃহীত পদে দূতী মাধবকে অনুরোধ করিতেছেন যে, পূর্বস্নেহ স্মরণ করিয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া চল।" বিদ্যাপতিকে আশ্রয় করিয়া নৃপতি-সিংহ-বিদ্যাপতির এই ভাব-প্রকাশ নিতান্তই বাংলা দেশের।

'নৃপতি' ভণিতায় এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত চারিটি পদ সংগ্রহ করিয়াছি। 'নৃপতি সিংহ' অভিন্ন কি না তাহা বলা যায় না। 'সিংহ' উপাধিও হইতে পারে, আবার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে। যাহাই হউক, এখানে নূতন পদগুলি উদ্ধৃত হইল।

১

সজ্ঘাতিনী নাগর চৌরস আপনা।
বিনহি সাধনে ভাঙ্গিল কানাঞি
মুনিক মান সমনা॥
মুখ শিঙ্গার করিতে আছিলুঁ
মুকুর লইয়া মুঠে।
ঢিট কানাঞি সকল দেখিল
দাড়াঞা আমার পিঠে॥
কানু বড় নিধি আধেক পেখলুঁ
আধ মুকুরের পাশে।
গীম মোড়া দিয়া ফিরিয়া চাহিতে
চুম্ব দিয়া কানু হাসে॥
এমন হাঠয়া সে হরিল দিয়া কে
গুণ কহিতে না জানে।
ভণে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
নৃপতি ইহ রস ভানে॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পত্রাঙ্ক ১১—১১-ক, পদ-সংখ্যা ৯৯)

২

সায়রে মরিব সখি করিয়া কুণ্ডলী।
কানুরে কহিয় যেন দেন তিলাঞ্জলী॥
সোই আপন কান হোয়ব যব রাধা।
তবয়া জানব বিরহক বাধা॥
শ্যাম তেজিয়া গৌর যব হোয় কান।
গৌর শ্যাম যব হো এক ভান॥
বিরহক যত দুখ জানব কাজ।
যত দুখ এ সুখ হৃদয়ক মাঝ॥
লছিমাক দুঃখ নৃপতি কি জান।
বিদ্যাপতি কবি দুখ পরমান॥

(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ১১০, পত্রাঙ্ক ১৩-ক)

৩

মাধব রাধা আজি স্বাধিনী ভেল।
কতহুঁ যতনে প্রকারে বুঝাওল
তব ধনি উতর না দেল॥
তোহারি নাম শুনে সুন্দরী
শ্রবণে দেই দৌ পানি।
তোঁহারি পিরীতি কি রীতি সম লাগয়ে
সো অব পূজয়ে বাণী॥
তোহারি কেশ কুসুম তাম্বুল
ধরল রাইক আগে।
কি পেখল কমলমুখী পালটি না পেখল
বৈঠল বিমুখ বিরাগে॥
... ...
কো মিটায়ব মান।
ভণ বিদ্যাপতি নৃপতি বুঝই
আগে পদারহ কান॥
(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ১২৯, পত্রাঙ্ক·১৫-ক)

৪

গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহ বিথিএ এ বেশ কওল
মালায় গুরুয়া ভার॥
রামা হে বচন না বোল আর।
তোহারি চরণে শরণ সে হরি
আর সাধব মান॥
সহজে চাতক না ছাড়ে প্রভক
বসই নদীক তীর।
নব জল আশে বাস বিনিহি
তনিক না পিয়ে নীর॥

যদি বিহি সে রসে অধিক পিয়াসে
সলিল হইল ঘোর।
নৃপতি তোহারি নাম শুনি শুনি
সঘনে গলয়ে লোর॥
(বরাহনগর পুথি ২২ : পদ-সংখ্যা ১৪০, পত্রাঙ্ক ১৬-ক)

৫

এত কহিতে সখি তুরিতে আওলি
সুধাময় দুই বাত না তুলি
কানু সুন্দর চতুর মন্দির
নিকটে আওই রে।
হরখি হসি বসি বোলয়ে রাধা
অচিরে বিহি পুন পুরল সাধা
শরদ চন্দ চকোর মিলি
নৃপসিংহ গাবই রে॥

[কী (অপ্র) পদ ১০৫৯]

উপর্যুক্ত পাঁচটি পদের কোনটিতেই 'নৃপতি সিংহ' ভণিতা নাই। প্রথম পদটিতে বিদ্যাপতি এবং নৃপতি উভয় নামই রহিয়াছে। দ্বিতীয় পদটিও তাই। আবার, উভয় পদেই বিদ্যাপতি কবি নৃপতি (নাম না ধরিয়া যদি রাজা অর্থ গ্রহণ করা হয়) কে উদ্দেশ করিয়া যেন এই সকল পদ শোনাইয়াছেন, এমনও হইতে পারে। তৃতীয় পদটিও একই পর্যায়ের। এখানেও বিদ্যাপতি এবং নৃপতি প্রথম এবং দ্বিতীয় পদের মতই ব্যবহৃত। কিন্তু পদ তিনটি বিচার করিলে বিদ্যাপতির শৃঙ্গার-রসাধিক্য ধরা পড়ে সত্য, তথাপি বাঙ্গালী কবির সুস্পষ্ট পরিচয় দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পদে রহিয়াছে। দ্বিতীয় পদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রের মধ্য দিয়া চৈতন্য-পরবর্তী কালের চিন্তাধারার পরিচয় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ পদে বিরহব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণের যে পরিচয় মানিনী রাধার নিকট ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব ভক্ত-হৃদয়ের প্রকাশ স্পষ্ট। চতুর্থ পদের ভণিতা শুধুই 'নৃপতি'-র। মৈথিল বিদ্যাপতির 'নদী বহ নয়নক নীর' পদটিকে অবলম্বন করিয়া

বাঙ্গালী কবি পদামৃতসমুদ্রে গৃহীত পদটি রচনা করিয়াছেন। যেন সেই কবিই চৈতন্য-ভাবাশ্রিত হইয়া নিজের ভক্ত হৃদয়টিকে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহার 'নাম শুনি শুনি, সঘনে গলয়ে লোর।' এই কারণে মনে হয়, নৃপতি সিংহ এবং নৃপতি সম্ভবতঃ অভিন্ন কবি-ব্যক্তিত্ব। তথাপি এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিদ্যাপতিকে অবলম্বন করিয়া নৃপতি, কবি নৃপতি বা নৃপতি সিংহ বিদ্যাপতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সেই কারণেই বিদ্যাপতির পদ-বিচারণার ক্ষেত্রে নৃপতি নামাঙ্কিত পদের আলোচনা নিতান্ত অপরিহার্য।

কিন্তু এই নৃপতি সিংহের ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু না বলা গেলেও, কয়েকটি তথ্য এ সম্পর্কে যে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'তে 'নৃপ উদয়াদিত্যস্য' ভণিতায় 'শ্যাম বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়' পদটি আছে। এই পদটির সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া গিয়াছে 'পদকল্পলতিকা'য়। এই নৃপ উদয়-আদিত্য, যশোহরের প্রতাপাদিত্যের পুত্র হওয়া অসম্ভব নয়। গোবিন্দদাস কবিরাজ পদমধ্যে 'প্রতাপ-আদিত্য'-র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত, নরোত্তম-শিষ্য প্রখ্যাত পদকর্তা বসন্ত রায়ের সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রাজা নরসিংহ (নরসিংহ রায়) ছিলেন নরোত্তমের শিষ্য। ডক্টর সুকুমার সেন এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনার ঐতিহ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে বলিব নরসিংহ এবং তাঁহার পাত্র (অর্থাৎ মন্ত্রী) রূপনারায়ণ রসিক ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের কল্পনায় শিবসিংহ-বিদ্যাপতি-লছিমা অনেকটা নরসিংহ-রূপ-নারায়ণের আধারেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। নরসিংহ রাজার পত্নীর নাম পদ্মাবতী ছিল কিনা জানি না।" ডক্টর সেন যদিও নরসিংহ রাজার পত্নীর পদ্মাবতী নাম সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলেন নাই, তথাপি তিনি 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামধেয় একটি পুথির পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ছত্র কয়টি পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।*

---

* বা. সা. ই. (অপরাধ), পৃঃ ৯১-৯২।

নরসিংহ রায় দেখ বাক্যনিষ্ঠ হৈয়া।
রসিক মণ্ডলে গেল রসিক হইয়া॥
রূপনারায়ণ পাত্র আছিল রাজার।
পদ্মাবতীর সম্প্রীত হইল তাহার॥ (পৃ. ২৭-ক)

রসিকমণ্ডলের এই রসিক রাজা নরসিংহ যে কবি নৃপতি বা নরসিংহ হইতে অভিন্ন, তাহা অনুমান করিলে একান্ত অসঙ্গত হয় না। যেখানে নরসিংহের অন্যতম বিশিষ্ট অমাত্য রূপনারায়ণেরও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।* ডক্টর সেন অবশ্য এই কবির সহিত ভূপতি ও চম্পতিকেও অভিন্নরূপে অনুমান করিবার অনুকূলে যুক্তি সন্ধান করিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত পক্কপল্লী নরসিংহের নূতন রাজধানী হইতে পারে।' এই অনুমানের সমর্থনে ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত না করিলে চলে না। ফলে, চম্পাহিট্টির রাজারূপে নরসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না এবং সেইজন্যই ভূপতি, চম্পতি এবং নৃপতিকে অভিন্নরূপে অনুমান অসম্ভব হইযা পড়ে। তবে এই কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে বিদ্যাপতির যোগ শুধুমাত্র নামেই এবং তাহা যে আরোপিত মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

॥ কবিবল্লভ ॥

শুধুমাত্র বাংলা দেশে প্রাপ্ত এবং সর্বপ্রথম পদকল্পতরুতে (৯৫৭) সংকলিত 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' বিখ্যাত পদটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় কর্তৃক বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া তাঁহার সংকলনে (৮৩৪) গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "এই পদ এই আকারে (অর্থাৎ বিদ্যাপতি ভণিতায়) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুথিতে প্রাপ্ত হন।" এই প্রসঙ্গে গুপ্ত মহোদয় আপন মন্তব্য লিখিয়াছেন, "মিথিলায় প্রায় এই পাঠ প্রচলিত আছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, মিথিলার

---

* প্রেমবিলাস ১৯ শ. বি., পৃঃ ৩৩২।

লোকমুখ হইতে সংগৃহীত গ্রীয়ার্সন হইতে আরম্ভ করিয়া হাল আমলের সংকলকগণের (সুধীরচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি) সংকলনে পদটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব দাসের মতো সুপণ্ডিত বৈষ্ণব কবি ও সাধক বিদ্যাপতির এই অপূর্বসুন্দর পদটিকে কবিবল্লভের ভণিতায় কেন চালান করিবেন তাহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, নেপাল বা রামভদ্রপুরের পুথিতে তো ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়ই না। তথাপি পদটির উপর বিদ্যাপতির দাবি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বোধ করি ইহার একমাত্র কারণ বিদ্যাপতির মহাকবিত্বের সুপ্রতিষ্ঠা। এই পদটির রচনাকার সম্পর্কে দীর্ঘকালীন বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। পদকল্পতরুর সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গবেষক সতীশচন্দ্র রায় পদটিকে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, পদকল্পতরু সম্পাদনাকালে যে সকল পুথিতে তিনি এই পদটি দেখিয়াছেন, সর্বত্রই কবিবল্লভের ভণিতা, কোথাও বিদ্যাপতি-ভণিতা নাই। "এতদ্ব্যতীত এই পদের প্রথম কলিতে এমন একটা চূড়ান্ত ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে, যাহাতে পদটিকে শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থের পরবর্তী রচনা বলিয়া স্বীকার না করিয়া কোন মতেই উহাকে তাঁহার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির রচনা বলা যাইতে পারে না।" এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হিসাবে তিনি পারিভাষিক শব্দরূপে 'পিরীতি' এবং 'অনুরাগ' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রেম বা পিরীতির পরিণতিরূপে অনুরাগ শব্দের লক্ষণ সম্পর্কে আছে,—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নোবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"

'অনুরাগ' তাহাই, যাহা রাগ বা প্রেমকে 'নবরূপে ধারণ করিয়া অনুভূত প্রিয়জনকে নব নব রূপে আস্বাদিত করায়'। (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ২৭)

শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুসরণে এই পদের রচনা সম্ভব হইয়াছে তাহা 'পিরীতি' এবং 'অনুরাগ' শব্দের পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ দেখিয়া

দৃঢ়ভাবেই বলা চলে। বিদ্যাপতির পূর্ববর্তী সাহিত্য-শাস্ত্রকারগণ (ভানুদত্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি) কেহই এই অর্থে শব্দদ্বয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করেন নাই।

ইহার বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন,—"আবার যে সমস্ত পদে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও তাহার শিষ্যবর্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবদর্শন ও অলংকার গ্রন্থের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয় সেগুলিও বিদ্যাপতির রচনা না হইবার সম্ভাবনা।.........বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট সুবিখ্যাত পদ 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' এই বিচার বিমূঢ়তার জলন্ত নিদর্শন।.........একের উপর যে অন্যের প্রভাব আছে এবং উভয়ের ভাবগত মিল যে কেবলমাত্র আকস্মিক নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়। এখন কে কাহার নিকট ঋণী ইহাই বিচার্য বিষয়।" (বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ২১) শ্রীরূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্রের সংজ্ঞা গঠনের জন্য পূর্ববর্তী কবি-সমাজের নিকট ঋণী হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই; কিন্তু সমকালিক কোন কবির কাব্যেই এই পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ কেন নাই, তাহা ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি কবিবল্লভের মাত্র একটি পদ আবিষ্কৃত দেখিয়া তাঁহার কবিসত্তাকে স্বীকৃতি জানাইতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। এ সম্পর্কে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের আলোচনার ধারা অনুসরণ করিতেছি। "পদকল্পতরুতে কবিবল্লভ ভণিতায় এই একটিমাত্র পদই উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু বল্লভ বা বল্লভ দাস ভণিতায় ২৫টি পদ সংকলিত হইয়াছে। ঐ পদগুলির মধ্যে ২৪টি পদের ভাষা পুরাপুরি বাংলা এবং তন্মধ্যে দশটি পদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার রীতি এবং কোন কোন স্থানে ভাষা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া লেখা। যথা, নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায়,—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর॥

বল্লভ দাসে,—
যে করিল জগজনে করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর॥" (তরু ২৯৮১)

এ ছাড়া ডক্টর মজুমদার পদকল্পতরুর 'সজনী প্রেমক কো কহ বিশেষ' (৭৭০) পদটি উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণিত প্রেমবৈচিত্র্যের সূত্রানুসরণ কিভাবে ঘটিয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। ফলে, কবিবল্লভ বা বল্লভ দাসের পদে শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির প্রত্যক্ষ প্রভাব যে লক্ষ্য করা যায়, তাহা অনস্বীকার্য হইয়া পড়ে।

ডক্টর মজুমদার এইরূপ বলিষ্ঠ যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বোধ করি তিনি সংস্কারপাশ কাটাইতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। তাই তিনি পরিশেষে লিখিয়াছেন,—"জনম অবধি'র ন্যায় কবিতা যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার কলম দিয়া দুই একটির বেশী ভাল কবিতা বাহির হয় নাই এরূপ অনুমান অসঙ্গত বিবেচনায় নূতন কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ইহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম।" (বিদ্যাপতির পদাবলী, পৃঃ ৪৭৪)

কোন কবির সকল রচনাই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে না, এ-কথা না মানিয়া উপায় নাই। এ পর্যন্ত মুদ্রিত বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যা চারি সহস্রের অধিক নয়, কিন্তু মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রাধিক।* সেক্ষেত্রে যেখানে দুই-তৃতীয়াংশই এখনও লোকচক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে কবিবল্লভের রচনার সংখ্যা নিরূপণ করা চলে না, রচনার উৎকর্ষগত আলোচনা তো দূরের কথা। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, বল্লভ দাসের ভণিতায় পদামৃতসমুদ্রে (৩টি) এবং সংকীর্তনামৃতে (১টি) পদ উদ্ধৃত আছে। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলন-গ্রন্থে বল্লভ ভণিতায় ১৯টি এবং কবিবল্লভের ভণিতায় আলোচ্য পদটি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বল্লভ নামধেয় একাধিক কবি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে মৃণালকান্তি ঘোষ লিখিয়াছেন,—"জগদ্বন্ধু বাবু দুইজন বল্লভ দাসের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মহাপ্রভুর

---

* শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য—ডঃ শুকদেব সিংহ (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত ভূমিকার ॥৴০ পৃষ্ঠা)।

সমসাময়িক পাঁচজন 'বল্লভ'-এর নাম চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। যথা—(১) বল্লভ সেন—শিবানন্দ সেনের আত্মীয়। (২) বল্লভাচার্য—মহাপ্রভুর প্রথমা ঘরণী লক্ষ্মীদেবীর পিতা। (৩) বল্লভচৈতন্য দাস—গদাধর গোস্বামীর শিষ্য। (৪) বল্লভ ভট্ট—প্রয়াগে প্রভুর সহিত প্রথমে মিলিত হন; পরে প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করেন। (৫) বল্লভ—রূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীজীবের পিতা। এতদ্ভিন্ন আচার্য প্রভুর শিষ্যের মধ্যে 'বল্লভী কবিপতি', 'শ্রীবল্লভ ঠাকুর', 'বল্লবী', 'বল্লবী কবিরাজ' ও শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য 'শ্রীবল্লভদাস'; এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যের মধ্যে 'বল্লভী মজুমদার'—এই কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ জনের পদকর্তা থাকিবার সম্ভাবনা।"

'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত পদের আলোচনায় ডক্টর মজুমদার লিখিয়াছেন,—'বল্লভ বা হরিবল্লভ নামটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উপনাম। বিদ্যাপতির অন্যতম উপাধি বল্লভ ছিল এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বল্লভ ভণিতার কোন কবিতা বিদ্যাপতির হইতে পারে না।"

ডক্টর মজুমদার কথিত বল্লভ বা হরিবল্লভ সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের বা অষ্টাদশ শতাব্দীব কবি যিনি ক্ষণদাগীতচিন্তামণির সংকলক। বল্লভ ভণিতাযুক্ত কোন পদের সঙ্গে হরিবল্লভের পদের যোগ নাই। কবিবল্লভ-কৃত 'রস-কদম্ব' নামে একটি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কবির নাম কি তাহা জানা যায় না, তবে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা ॥
করতোয়াতীর মহাস্থানের সমীপে।
অরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে ॥*

'রস-কদম্ব' রচনার সমাপ্তিকাল ১৫২০ শক অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। নরোত্তম দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে খেতুরী উৎসবে উপস্থিত হেমলতা

---

* রসকদম্ব—কবিবল্লভ। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৩২) ভূমিকা ।/০

দেবীর দীক্ষিত শ্রীনিবাস-শিষ্য কবিবল্লভের উপস্থিতির কথা জানা যায়। হরিদাস দাস মহোদয় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যপাদানং গুণভেদসূচকম্' পুস্তিকায় দেখা যায়,—

> পশ্চাদ্ যঃ কবিবল্লভং তদনুজং শ্রীশ্যামভট্টং তথা
> হ্যাত্মারামমতো নয়ন্ নিজপদং শ্রীনাড়িকং যো মুদা।
> শ্রীগোপীরমণাং তদনুজং দুর্গাখ্যদাসং প্রিয়ং
> সোঽয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

(কবিবল্লভ ও তাঁহার অনুজ শ্যাম ভট্টকে. আত্মারাম দাসকে ও শ্রীনাড়িককে, বৈদ্য শ্রীগোপীরমণ দাস ও তদনুজপ্রিয় দুর্গাদাসকে শ্রীনিবাসপ্রভু করুণা করিলেন।)

কবিরাজ গোবিন্দদাস কবিবল্লভের রসবৈদগ্ধ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহার সুবিখ্যাত 'আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে, যব ধরি পেখলুঁ কান' পদের সমাপ্তি-চরণে।

> প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
> রসবতি রস-মরিযাদ॥ (তরু ২৩৪)

যে কবির 'জনম অবধি রূপ' নেহারনে নয়ন তৃপ্ত হয় নাই, লক্ষ যুগের হৃদয়বন্ধনে হৃদয় শীতল হয় নাই, যে কবির সর্বশেষ আশ্রয় 'অনুভব', বোধ করি তিনিই 'লাখে', 'এক' এবং তাই কবি-রাজ গোবিন্দদাস আর এক কবি-শ্রেষ্ঠের স্মরণ-তর্পণ করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়াছেন, তাহাই কে বা না বলিতে পারেন?

চতুর্থ অধ্যায়

সহজিয়া বিদ্যাপতি

এক

প্রাক্‌চৈতন্য কালের কবি চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদ যেমন বিখ্যাত, তেমনি তাঁহাদের জীবন-কথাও। রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমমূলক কিংবদন্তী যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে লছিমা-বিদ্যাপতির পরকীয়া প্রেমের কিংবদন্তী। লছিমা-বিদ্যাপতিকে লইয়া সহজ সাধকগণ চণ্ডীদাস-রামীর অনুরূপ কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কাহিনীব সত্যতা বিদ্যাপতিব জীবন-বৃত্তান্ত বা তাঁহার রচিত পদের মধ্য দিয়া প্রমাণ করা যায় না। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়-কাব মুকুন্দদাস গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে চণ্ডীদাস-রামীর সহিত বিদ্যাপতি-লছিমার পরকীয়া প্রেমেব কাহিনী যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই স্থানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন মুকুন্দদাস। তাঁহার গ্রন্থের এ পর্যন্ত যতগুলি প্রামাণিক পুথি পাওয়া গিয়াছে, সব কয়টিই ষষ্ঠ প্রকরণে সমাপ্ত হইয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুত কালীকিঙ্কর দত্ত মহাশয়ের নিকট সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়েব ষষ্ঠ প্রকরণে সমাপ্ত একটি প্রামাণিক পুথি আছে। যাহা হউক, সপ্তম প্রকরণ হইতে গৃহীত নিম্নোক্ত অংশে (সহজিয়াগণের রচিত প্রক্ষিপ্ত অংশ) দেখি,—

> চণ্ডীদাসের কহিলাম এই বিবরণ।
> বিদ্যাপতি ঠাকুরের শুনহ কারণ॥
> শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমা সুন্দরী।
> বিদ্যাপতি আস্বাদিলা সে রস-মাধুরী॥
> একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতি লইয়া।
> কহিতে লাগিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
> "রাধা দেখি কৃষ্ণ যেন এখনি আইল।
> প্রিয় নর্ম সখাগণে কহিতে লাগিল॥"
> এই মতে এক পদ করিয়া বর্ণন।
> আমারে শুনাও শুনি জুড়াক শ্রবণ॥

লছিমারে না দেখিলে না পারে বর্ণিতে।
সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে ॥
কোনছলে গোধূলি সময়ে কবিবর।
প্রবেশ করিলা গিয়া মহল ভিতর ॥
সুবেশা হইয়া সেই লছিমা সুন্দরী।
দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী ॥
হেনকালে বিদ্যাপতি তাঁহারে দেখিল।
ইঙ্গিত করিয়া বামা অভ্যন্তরে গেল ॥
মদনে পীড়িত কবি না পাইয়া দর্শন।
নিজভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন ॥
সেই পদ নৃপতিরে আসি শুনাইল।
শুনিয়া রাজার মনে সন্তোষ পাইল ॥ (পৃ. ১০৭-১০৮)

এই ঘটনার পর 'নিজভাবেকৃষ্ণভাব' এবং লছিমার ভাবে শ্রীরাধিকার বর্ণনা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নয়, কবি যখন স্বয়ং নৃপতিকে শোনাইতেছেন তখন পদমধ্যে রাজা এবং মহিষীর নাম উল্লেখও সহজতর হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়-কারের বর্ণনায় দেখা যায়, বিদ্যাপতিকে লছিমা ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং কবিও 'মদন পীড়িত'। ইহার পর পরকীয়া প্রেমের আসর জমিতে আর বিলম্ব হয় না। চণ্ডীদাস-তারা, লীলাশুক বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি পরকীয়া আখ্যায়িকার ধারায় বিদ্যাপতি ও লছিমা বাঁধা পড়িলেন।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ ॥
বেশ্যা চিন্তামনিস্তএ সক্তো লীলাশুকস্তথা।
এতেষাং স্বাত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ় সুরোত্তমঃ ॥ (পৃ. ১১২-১১৩)

[ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস তারানাম্নী রজকীর সঙ্গী এবং বিদ্যাপতি রাজকন্যা অথচ রাজপত্নী লছিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীতে এবং লীলাশুক বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন। এই সকল পুরুষের সাত্বিক ভাব প্রৌঢ় ও দেবোত্তম বলিয়া পূজিত।]

লছিমা-বিদ্যাপতিকে সহজভাবের মালা পরাইবার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির

ভণিতা অনেকক্ষেত্রেই সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতির জীবন-কথা ও কবিকর্মের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলে [দ্রঃ মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকা] ভণিতায় লছিমা নামের সংযুক্তি হইতে বিদ্যাপতির সহিত লছিমা দেবীর পরকীয়া প্রেমের কোনই প্রমাণ মিলে না। বিদ্যাপতির সুদীর্ঘ জীবনকালে যে কয়জন রাজা [ও রানীর] পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম তিনি অনেকক্ষেত্রেই পদমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শিবসিংহের রানী ছিলেন লছিমা দেবী। শিবসিংহের নামই বহুপদের ভণিতায়। সেইজন্য রাজার অপরাপর ছয়জন মহিষীর [লছমী, সুখমা, রূপিনী, মেধা, মধুমতী, সরমা]* মধ্যে প্রিয়তমা মহিষীর নাম উল্লেখ করিলে, কবি ও রানীর পরকীয়া সম্পর্কের কোন প্রমাণ হয় না। বিদ্যাপতির পদের ভণিতায় শিবসিংহ এবং লছিমার নামের সংযুক্তি যদি এই কিংবদন্তীর নির্ভরভূমি হয়, তবে বিদ্যাপতির অন্য যে সকল পদে অন্যান্য রানীগণের উল্লেখ দেখিতে পাই, সেগুলিকেও একই যুক্তি অনুসরণ করিয়া সেই সেই রানী ও বিদ্যাপতির পরকীয়া সম্পর্ক ছিল এরূপ মনে করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তালপত্রের পুথি অনুযায়ী বিদ্যাপতির পদে সুখমাদেবীর নাম দেখা যায়।

> রাজা রূপ নরাঅন জান।
> রাএ সিবসিংহ সুখমা দেই রমান॥ (ন. গু. ১২৭)

মধুমতী দেবীর নামও বিদ্যাপতি পদমধ্যে নিম্নরূপভাবে করিয়াছেন,—

> বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবএ
> নব জউবন নব কন্তা।
> সিবসিংহ রাজা এহ রস জানএ
> মধুমতী দেবী সুকন্তা॥ (ন. গু. ১৮৬)

---

* Bhanitas in Vidyapati's Padas by Dr B. B. Majumder. Journal of the Bihar & Orissa Research Society—Vol. XXVIII, Part IV, P. 418.

রূপিনী দেবীর নামও বিদ্যাপতি পদমধ্যে সংযুক্ত করিয়াছেন,—

বিদ্যাপতি ভণ এহ রস জান।
রাএ সিবসিংহ রূপিনি দেই রমান॥ (ন. গু. ৬৭৮)

রাগতরঙ্গিণীর একটি পদে সরমা দেবীর নামও দেখা যায়,—

ভনে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
সাহসেঁ সকম কাজে।
বুভ সিবসিংহ রস রসময়
সোরম দেবী সমাজে॥

এইভাবে বিদ্যাপতির পদসমুদ্রে শিবসিংহের উপর্যুক্ত ছয়জন মহিষীর নাম রহিয়াছে। লছিমার নামোল্লেখেই যদি বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার পরকীয়া প্রেমের কাহিনী কল্পিত হইতে পারে, তবে এই মহিষীগণ সম্পর্কেও সেই একই সূত্র অনুসরণ করা যাইতে পারে। কবি প্রথম বয়সে পদ লিখিয়া শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে হাসিনী দেবীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। রাজার সহিত রানীর নাম উল্লেখ করা সেকালের মিথিলার কবিগণের রীতি ছিল। এইরূপ উল্লেখ হইতে অন্য কোন রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না। তাহা ছাড়া, সমকালিক কবিগোষ্ঠীর পদেও যখন এইরূপ উল্লেখ দেখি, তখন সেই কবিদেরও এই একই সূত্র ধরিয়া পরকীয়া প্রেমের রাজ্যে নামাইয়া আনিতে হয়। লোচনের রাগতরঙ্গিণী হইতে কবি অমিয়করের অনুরূপ একটি ভণিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভনই অমিয়কর সুনু মধুরাপতি
রাধা চরিত অপারে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমাদেই কণ্ঠহারে॥ (পৃ. ৮৪-৮৫)

এই সূত্র অনুসরণ করিলে বিদ্যাপতির সমকালিক কবিগণ যখন রাজা ও রানীর উল্লেখ করিয়া আপন নাম সংযুক্ত করেন, তখন সেই কবি ও রানীকেও বিদ্যাপতি ও লছিমার মতো পরকীয়া প্রেমের বাঁধনে বাঁধিতে হয়। কবি জীবনাথের একটি ভণিতায় আছে।—

দান কল্পতরু মেদিনি অবতরু
নৃপ হিন্দু সুরতানে।
মেধাদেই পতি রূপ নরাএন
প্রণবি জীবনাথ ভাণে॥

সুতরাং কবি জীবনাথ ও মেধাদেবীও অনুরূপ ভাগ্যের অধিকারী, এরূপ বলা চলে না। প্রসঙ্গতঃ মনে হইতে পারে, অপর কবিগণের সম্পর্কে যেক্ষেত্রে এরূপ বলা হয় না, সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতির এই কাহিনীতে সত্যতা থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অপর কবিগণের কেহই বিদ্যাপতির মতো খ্যাতিমান ছিলেন না। তাঁহাদের উপর এইরূপ আখ্যায়িকার বোঝা চাপাইয়া সহজিয়াগণের বড় একটা বেশী লাভ হইত না। সেইজন্য তাঁহারা কবিরাজ চক্রবর্তী বিদ্যাপতিকেই আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ, তাহাতে তাঁহাদের লাভ হইবে বেশী।

লছিমা ও বিদ্যাপতির প্রেমের গভীরতা দেখাইবার জন্য প্রক্ষিপ্ত পদ-রচনাকারিগণ নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। লছিমার সহিত প্রণয় অপরাধে কবি বিদ্যাপতিকে রাজা শিবসিংহ শূলে চড়াইবার আদেশ দিয়াছেন, সে-কথাও বিদ্যাপতির ভণিতায় সহজিয়া কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু ইহাতেই তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন। বিদ্যাপতিকে যখন শূলের উপর চড়ানো হইয়াছে, তখনও সহজিয়াদের বর্ণনানুসারে কবি নিজের নামের সহিত লছিমার নাম যুক্ত করিয়া পদ রচনা করিতেছেন! এহেন কাহিনীর বর্ণনা করিয়া সহজিয়াগণ সকল বিশ্বাসের মূলে আঘাত দিয়াছেন এবং এই পরকীয়া আখ্যায়িকার অসত্যতা নিজেরাই প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য, শূল পর্যায়ের পদমধ্যে তাঁহারা মহাকবি বিদ্যাপতির দুইটি পদ এবং বিদ্যাপতির ভণিতায় গোবিন্দদাসের একটি পদ যুক্ত করিয়া, ইহা যে বিদ্যাপতির রচনা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই চেষ্টা যে অপচেষ্টারই নামান্তর মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। শূল পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির 'মাধব বহুত মিনতি তোয়', 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম' এবং গোবিন্দদাসের [বিদ্যাপতির ভণিতায়] 'প্রেমক অঙ্কুর আঁত জাঁত ভেল' পদত্রয় পাওয়া যায়। শূল

পর্যায়ের এই পদগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কাটোয়া শ্রীখণ্ডে, সহজিয়াগণ বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। ফলে, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ব্যতিরেকেও এগুলিকে সহজিয়া কবিদের রচনা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায়। নিম্নে শূল প্রসঙ্গের নূতন পদগুলি দেওয়া গেল। ক্রম রক্ষার জন্য পরিচিত পদত্রয়ের উল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে।

(ক) 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম' (বৃন্দাবনের খাতায় 'শূলের চৌদ্দপদ' প্রবেষকের প্রথম পদ। অন্য কোন পুথিতে এই পদটি নাই।)

১

ঝাঁপলুঁ কূপ লখই ন পারই
আরতি পড়ল উধাই।
পাহলহি লঘু গুরু ন সমঝলুঁ
পাছে বহুত পস্তাই ॥
সজনী মন্দ প্রেম পরিণামে।
আপন জীবন করলু পরাধীন
না উপজল একুঠামে ॥
মধুসম বচন কুলিশ সম ভাখই
সো হাম বুঝাই না ভেল।
দুশমন হাথে অবহিঁ হাম পড়লহিঁ
গুরুয়া গৌরব দূরে গেল ॥
পরের ভাল মন্দ বুঝিতে না পারিয়ে
বিপথে পাড়লে চেতায়।
আপনক হাথে শূল ছাঁচি লেয়লুঁ
অব দোষ দেয়ব কায় ॥
ব্রজকুল নায়ক সুখ দুখ দায়ক
কবি বিদ্যাপতি ভণে।
গোপভরমে হাম কোপ বাঢায়লুঁ
বিহিক হৃদয় কিবা জানে ॥

(১২০০ সালের নিজস্ব পুথি ; সা. প. প. ১৮১ ; ক. বি. ৩৭৪৩, ৪৫৩১ ; ১০২৬ সালের নিজস্ব পুথি ; বৃন্দাবনের খাতার ২নং পদ : শূলের পদ পর্যায়ের প্রথম পদ)

দেখিতে পাই নাই বলিয়া কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। প্রেমের বশেই ধাবিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সজনি, প্রেম পরিণামে মন্দ হইল। আপন জীবন পরাধীন করিলাম কিন্তু একত্রিত হইতে পারিলাম না। অমৃত বচন বজ্রসম দেখিতেছি, তাহা বুঝাইতে পারিতেছি না। দুশমনের হাতে পড়িয়া আমার গুরু গৌরব দূরে গেল। পরের ভাল-মন্দ বুঝিতে পারি না। বিপদে পড়িলে সকলই ঠিক হয়। নিজের হাতে শূল লইলাম, এখন কাহাকে দোষ দিব ? ব্রজকুলের যিনি নায়ক তিনিই সকল সুখ-দুঃখ-বিধায়ক, ইহাই কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন। তাঁহাকে শুধুই গোপ ভাবিয়া আমি কোপ বাড়াইয়াছি, কিন্তু বিধাতার হৃদয় কেহ জানে না।

শূলের এই প্রথম পদটিতে সুকৌশলে খাঁটী বিদ্যাপতির পদের অনেকগুলি চরণ অবিকল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার সঙ্গে অবলীলাক্রমে শূলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তেলে ও জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি সহজিয়াগণ পদমধ্যে 'বুঝিতে না পারিয়ে', 'বুঝাই না ভেল', 'বিপথে পড়িলে চেতায়' প্রভৃতি খাঁটী বাংলা শব্দাংশ মৈথিল চরণগুলির সহিত যোজনা করিয়া এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পাকাইয়াছেন। পদটি কবির উক্তি। সুতরাং, শূলের উপর বসিয়া এরূপ পদ-রচনার সার্থকতা কি !

২

শূল শেল যব মরমহি পৈঠল
তবহুঁ পড়লুঁ[১] মুরছাই।
বিরহক বেদন বিপত হোয়র[২]
জপতহিঁ তঁহি ধনি রাই[৩]॥
হরি হরি কিয়ে বিধি বিপরীত ভেল[৪]।
কাজ গাঢ় প্রেম[৫] কোই না সমঝলুঁ[৬]
জগমাঝে রহি গেল শেল[৭]॥

বহুতহি মান জ্ঞান তপ সেবলুঁ[৮]
ফল বহু সময় উপেখি।
বিহিক কলম মিটি যদি লেখব
অন্যজন কোই না দেখি[৯] ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী
ই রস কোহি[১০] না জানে।
ধরম বিচারি[১১] বিধি মোবে কবলহিঁ[১২]
আন কহিতে কহি আন[১৩] ॥

(১২০০ সালের পুথি, ক. বি. ৩৭৪৭ ; ১০৯৬ সালের পুথি, সা. প. প. ১৮১, ক. বি. ৪৫১৩ : ২-সংখ্যক পদ)

পাঠান্তরঃ ১ তবহি পড়ল (বৃন্দাবনের খাতা); ২ বিপরীত হোয়ল (বৃ, ১০৯৬ সালের নিজস্ব ২নং পুথি, ক বি. ২৩৯৬); ৩ যাই (নি ২), জপ তহি ধনি ধনি রাই (বৃ, ক. বি. ২৩৯৬); ৪ ভেল বিপরীত কাজ (বৃ); ৫ গায় প্রেম রস (নি ২, বৃ); ৬ সমুঝল (বৃ), ৭ জগতলে হিল বড় শেল (নি ২), জগমাঝে ইহ বড় লাজ (বৃ), জগতলে ইহ বড় লাজ (ক. বি. ২৩৯৬); ৮ সিবলুঁ (নি ২); ৯ ব্রতহি মান জ্ঞান তপেশ্বরী ফল ফুল সমৃদ উপেখি। বিহিক কলম অব মিটিযব লেখব অন্য কোই না দেখি ॥ (বৃ), ১০ কোই (বৃ), ১১ বিচার (বৃ); ১২ বিহি মোবে বঞ্চল (নি ২), বিহি মোরে না করল (বৃ); ১৩ কহে আনে (নি ২, বৃ)।

এইটিও কবির উক্তি। তাই কি কবি শেষ পর্যন্ত বলিতেছেন 'আন কহিতে কহি আন' অর্থাৎ এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা বলিতেছি।

৩

ইন্দ্র আদি করি সুর নর দানব
ত্রিপুর জিনিল[১] দশমাসে।
বিশ বাহু পর বিজয় ধনুর্দ্ধর
নৃপতি নিশাচর সাথে ॥
মনিময় কুণ্ডল রতনময় ভূষণ
শোভা করিছে[২] দশমুণ্ডে।
দিগ বিজই করি বিক্রম বলধরি
ছত্র ধবল নবদণ্ডে[৩] ॥

সেই লঙ্কাপতি দৈবে হরল মতি
বিপদ সময় যব ভেলা।
কনক মুকুট পর বনচর বানর
চরণঘাত কত দেলা॥
হরি হরি দৈবকি গতি নাহি জান।
কবহুঁ রাজপদ কবহুঁ সুখ সম্পদ
কবহুঁ গুরুয়া অপমান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুণবর জগজন
বড় বলবন্ত গোসাঞি।
সুখ সম্পদ যত দৈব নিয়োজিত
আপন হাথ কিছু নাঞি[৪]॥

(১০৯৬ সালের পুথি)

পাঠান্তরঃ ১ জিতল (ক বি. ২৩২৬), ২ করয়ে (বৃ); ৩ নবখণ্ডে বৃ), ৪ যে কিছু করনি সকল তাঁকর মোর হাথ কিছু নাঞি (১২০০ সালের পুথি), সুখ দুখ সম্পদ দৈব নিয়োজিত আপন হাতে কিছু নাঞি (বৃ)।

রাজার দণ্ডাদেশে কবিকে শূলে দেওয়া হইযাছে বলিয়া, কবি মহা-প্রতাপশালী রাবণেরও যে অবশেষে পরাজয়ের অপমান এবং সামান্য বানরের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কিন্তু তুলনাগুলি মোটেই সঙ্গত হয় নাই। কেননা, কবি কখনই রাবণের ন্যায় প্রতাপবান ছিলেন না এবং রাজাও বানরের ন্যায় ছিলেন না।

পদটিতে রাবণের উল্লেখ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি ভণিতায় 'গোসাঞি' শব্দটিও চৈতন্যপরবর্তী কালের প্রভাব সূচিত করে।

৪

অব কি করব প্রতিকার[১]।
আপদ ওখদ কোন খিলায়র
কোন করন প্রতিকার॥

হরি হরি রহল[২] দারুণ খেদ।
সুখ লাগি প্রেম ,যতনে বাড়ায়লুঁ
বিহি তাহে করল বিচ্ছেদ॥
পর উপগার হাস সার করি মানিয়ে[৩]
না জানিয়ে[৪] হই বিপরীত।
তসরক কীট সমান হাম হোয়লুঁ
বিহি তাহে করল বঞ্চিত[৫]॥
বিদ্যাপতি ভ্রম যব হোয়ল
কি করব জগজন লাজ।
অন্তকাল গতি মনে মনে সমঝলুঁ
এবহি তরাহ বিদগদ রাজ[৬]॥

(১০৯৬ সালের পুথি)

পাঠান্তর: ১ অবধিনু করব প্রতিকার। (বরাহ ২৬), হরি হরি কি করব প্রতিকার। (বৃ); ২ বাঢ়ল। (বরাহ ২৬, বৃ); ৩ মানলুঁ। (বরাহ ২৬, বৃ); ৪ জানলুঁ। (বরাহ ২৬, বৃ); ৫ না জানলুঁ বিধাতা বঞ্চিত। (বরাহ ২৬) জানলুঁ বিহিক বঞ্চিত। (বৃ); ৬ ত্রাহি তরাহ যদুরাজ। (বরাহ ২৬) ত্রাহি ত্রাহি নটরাজ। (বৃ)

[এই পদটির পরেই ১০৯৬ সালের পুথি, ১২০০ সালের পুথি এবং ক. বি ৩৭৪৭ পুথিতে বিখ্যাত পদ 'মাধব বহুত মিনতি করু তোয়' আছে। এই পদটির পর উপর্যুক্ত তিনটি পুথি ছাড়াও সা প. ১৮১ এবং ক. বি. ৪৫৩১ পুথিতে নিম্নোক্ত পদটি আছে।]

বিদ্যাপতির ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রেম করিয়াছিলেন এবং জগৎ ভরিয়া তাঁহার কলঙ্ক হইল, এই খেদ কবির মনে জাগিতেছে।

৫

মাধব সঙকটে লেহ তরাই।
আপন করম প্রতি- ফল যব ভুঞ্জব
তবে তোহে কোন[১] বড়াই॥

[২]অমিট মিটল তুয়ামিট তহি
তুয়ামিট মিটলে না যায়[২]।
বয়াস অজামিল তাহার সাক্ষি
অব যত তোহে সমুঝায় ॥
[৩]বিপদে পশুগণ নেয়ত তুয়াগুণ
না মানত সম্পদ সমহি[৩]।
তাহা তরাইতে যব নাহি পারবি
চিন্তামণি নাম ছোডবি তবহি ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন যতুনন্দন
ইহ বড দারুণ শেল।
[৪]হিত কহিতে অনহিত হোয়ত
নিজ দোষ সৌভি গেল[৪] ॥ (১০৯৬ সালের পুথি)

পাঠান্তরঃ ১ কৌন। (১২০০ সালের পুথি); ২—২ অমিট মিটল যদি মিটলে না যাই। (১২০০) অমিট যে না মিটত তুয়া নামে মিটত সুত মুখে শুনল গাই (বৃ); ৩—৩ বিপদগ্রস্তজন লেয়ব তুয়া গুণ মানব সম্পদ সমহি। (ক. বি. ২৩৯৬) বিপদে সুজন লয়র তুয়া গুণ মানব সম্পদ সমহি। (১২০০) বিপদে এ সুজন গাই তুয়া গুণ মান বিসম পদ সমহি (বৃ), ৪—৪ হি ৬ কহিতে অহিত করি মানল নিজ দোষে বঞ্চিত ভেল। (১২০০) হিত কহিতে সব অহিত হোয়ল নিজ দোষে সো ভৈ গেল ॥ (বৃ) হিত কহিতে অনহিত হোয়ত নিজ দোষে সো সব ভৈগেল ॥ (ক. বি. ২৩৯৬)

মূল পাঠের দ্বিতীয় চরণটি বিকৃত। উহার বৃন্দাবন পুথির পাঠান্তরই ঠিক। উহার অর্থ—যাহা অমার্জনীয়, তাহাও তোমার নামে মার্জনীয় হয়,—এই কথা পুরাণবক্তা সুতেব মুখে শুনিয়াছে। ভাগবতের গজরাজের স্তবের উল্লেখ করিয়া কবি বলিতেছেন, বিপদে পশুগণও তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমিও পশুতুল্য, তোমার চরণে শরণ লইতেছি। শেষ চরণটিতে ১২০০ সালের পুথির পাঠই গ্রাহ্য। উহার অর্থ এই যে, আমাকে ভালো কথা যাহারা বলিতে আসিয়াছিল, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই। তাই আজ নিজের দোষেতেই এই দুর্দশায় পড়িয়াছি।

৬

মাধব জনমে জনমে করি আশ[১]।
কুমতি কঠিন জন বিপদে যদি না তরবহিঁ[২]
তবে কহলুঁ এ তুয়া পাশ[৩] ॥
[৪]সম্পদ সময অতি ঘোষণা নাহি হোয়ত
তাহে দেতলি বাচ।
আচালক আহিঁ শমন দূত বৈঠল
দুশমন দেয়ত বাচ ॥
তোহঁরি নাম অনু সিতল না কহল
সম্পদ, মনোরথে হাম[৪]।
শূল শেল মাঝে যবহুঁ পড়ল হাম
তবহুঁ জপল তুয়া নাম ॥
কাতর হোই রোই শিবসিংহ তু বভুঁ[৫]
জীবন মটপটী জান।
হরি হরি রসনা[৬] বোলই ঘন ঘন
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ (১০৯৬ সালের পুথি)

পাঠান্তর : ১ হরি হরি জনমে করি আশ। (বৃ), ২ বিপদে পড়ল যব (বৃ, ১২০০); ৩ তবাহিঁ কহায়লুঁ তুয়া দাস (১২০০) তবহিঁ কহল তুয়া দাস (বৃ), ৪ সম্পদ সময় আসি মসি না রাখলুঁ তাহে কি দেয়রি বাড। আচালক যাই সময়ে যদি পৈঠলুঁ পুন মনে দেয় ও নিবার॥ তুঁহারি নাম অনুশীলন সম্পদে না করি হাম। (১২০০) সম্পদ সময়ে অশিখান না রাখত তাহে দেয়ল বাড। অচানক আই সময়ে যব ভেটল দুষমনে দেয়ল বার॥ সম্পদ বেরি তোহারি অনুশীলন করহি না করলহি হাম। ৫ কাতর হোই শিববরি রোই (১২০০) কাতর হোই শিব শিব কহই (বৃ), ৬ অবহুঁ রসনা (বৃ)।

এই পদে কবি লছিমার নাম করেন নাই। অথচ শিবসিংহের নাম করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, তিনি শুধু হরির করুণাই ভিক্ষা করিতেছেন না, শিবসিংহের কৃপাও চাহিতেছেন।

৭

মাধব বেরিক এক[১] কর অবধান।
বোল বয়ান নয়ন কক ঘন ঘন[২]
অন্তরে ধরত ধীয়ান॥
[৩]দারুণ লোভে ক্ষোভে বর ধীবর[৪]
কাল জলে দেই ঝাঁপে।
জল বিনে মীন ত্যাগয়ে যেন নিজতনু[৫]
দারুণ তপন তপন কী তাপে॥
চাতকে জল বিনে প্রাণ ত্যাগয়ে
তভু নাহি পিবই নীরে[৬]।
তৈছন ব্রত হোই আরপিযে[৭]
সম্পর্ণ করিয়ে শরীরে॥
ঐছন সময়ে নৃপতি বর বল্লভ
যায়ল নিজ মন্দিরে[৮]।
বিদ্যাপতি গতি দেখি অতি চমকিত
ধাই আয়ল তহ ধীরে[৯]॥

পাঠান্তরঃ ১ একু (ব), ২ বোলত বযান নয়ান ঝর ঝর (১২০০), ৩ ১২০০ সালের পুথিতে এবং বৃন্দাবনের খাতায় এইখানে ৮ম ও ৯ম ছত্র এবং তাহার পরে একাদশ ও দ্বাদশ ছত্র আছে। ৪ ক্ষোভিত ধীবর (১২০০) ক্ষোভ করি ধীবর (বৃ), ৫ চাতক জল বিনু তেয়াগয়ে নিজ তনু (১২০০) জল বিন মীন ছোডত নিজ তনু (বৃ), ৬ চাতক জল বিনে প্রাণ নিজ যায়ত তবু নাহি পিয়ত নীরে (বৃ), ৭ তৈছন ব্রত করি সোই আরপিয়ে (১২০০), ৮ ধাই আওল নিজ মন্দিরে (১২০০) আওল নিজহি মন্দিরে (বৃ)। ৯ বিদ্যাপতি গতি দেখি চমকিত ধরি বসাওল ধীরে॥ (১২০০) বিদ্যাপতি মতি দেখিয়ে চমকিত ধাই আওল সেই ধায়ে॥ (বৃ)

বিপন্ন হইয়া কাতরভাবে কবি যখন ভগবানের চরণে শরণ লইতেছেন, তখন শিবসিংহ সেই পথে যাইতে যাইতে কবিকে দেখিতে পাইলেন। কবি পদের মধ্যে সে-কথাও লিখিয়া রাখিলেন।

৮

দীন দয়াময় জগ মন মোহন
জগ জীবন যদু নন্দন হে[১]।
দামোদর মাধব মুরারি কেশব
করুণা কর দীন জনে হে[২] ॥
মুঞি বোলত বারে বারে
নিশি দিশি তুয়া গুণ হে[৩]।
মথুরানাথ নিবেদিয়ে অন্তরে[৪]
বেরিল এক কর অবলোক কে[৫] ॥
রসনারে কহ কহ হরি বদনে।
কাতরে দীন দয়াময় ফুকরই
জনমহুঁ না হেরলুঁ তুয়া বরণে[৬] ॥
মৎস্য কূর্ম বরাহ নরহরি
উদ্ধারিত বলি বামনে।
রাম রাম রাম জগন্নাথ কলিক
কবি বিদ্যাপতি ভ্রমহি ভণে[৭] ॥

পাঠান্তরঃ ১ জগজীবন যদুনন্দনে (১২০০) ফুকরহ জগজীবনে যদুনন্দনে। (বৃ); ২ দীনজনে ॥ (১২০০) দামোদর কেশব মো বড়ি অধমে করুণ কর হরি দীনজনে ॥ (বৃ); ৩ ঘন ঘন বোল রাধে রাধে জপই নিশি তুহাঁরি গুণে (১২০০) মুঞি বোলত রাধা রাধা নিশি দিশি তোহারি গুণে ॥ (বৃ); ৪ নিবেদিয়ে অতএ (১২০০) নিবেদই অন্তরে (বৃ); ৫ বেরি এক কর আলোকনে ॥ (১২০০); ৬ রসনায়ে কহ হরি পরাণে। কাতরে দীন দয়াময় ফুকরি ফুকরি জনম হেরহু বয়ানে ॥ (১২০০) রসনায়ে কহ কহ হরি হরি ধরিয়া ধেয়ানে। কাতরে দীন দয়াময় ফুকারহ জীবন রহু যব বয়ানে ॥ (বৃ); ৭ মৎস্য কূর্ম বরাহ নরসিংহ বলি উদ্ধারিয়ে বামনে। রাম রাম কলি কলি যুগতারণ কবি বিদ্যাপতি ভ্রমহি ভণে ॥ (১২০০) রাম জগৎপতি তারণ কলিকরূপে কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ (বৃ)

এই পদের রচনাকার যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণকেই ডাকিতেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি দশ অবতারের আশ্রয় গ্রহণ

করিতেন না। বলা প্রয়োজন মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ধর্মে শৈব ছিলেন। এই পদের রচয়িতা শৈবও নন, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবও নন, সাধারণ হিন্দু মাত্র।

৯

বনমালী বনতেজি কর অবধান।
অব নাহি ছোডব নিঠুর কান[১]॥
উর্দ্ধ পবন ভেল তিন জন ঘেরল
রসনা বশ নাহি মানে।
কেবল সাহস করি শরণ লইনু হরি
না হহিতে কহয়ে বয়ানে[২]॥
নিকরুণ হৃদয় করু[৩] দুর।
নিকরুণ হোই জোই জোই জনমিয়ে[৪]
কবহুঁ হোয়ে মনোরথ পুর[৫]।
কহ ইথে ভাস ত্রাস তাহে হোয়ত
বিসরিত পাছে হয়[৬] জান।
রাধামাধব মাধব ফুকরই[৭]
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ (১০৯৬ সালের পুথি)

পাঠান্তরঃ ১ আখি নাহ জীবন অব ছোডব শুনহ নিঠুর কান॥ (১২০০) অবধি নাহি জীবনে—শুন নিঠুর বর কানা। (বৃ), ২ কেবল সাহসে তবহি সরণ পুরি না কহিতে করত বয়ান॥ (১২০০) না কহিতে কহয়ে বয়ান। (বৃ); ৩ হৃদয় কর। (১২০০) বিহি করু। (বৃ); ৪ জনসহ। (১২০০) জনমহি। (বৃ); ৫ রসপুর। (১২০০), ৬ নিশ্চয়িত পাছে হোযে। (২০০) বিছুরিত পাছেইহ। (বৃ), ৭ ফুকারই। (বৃ)

এখানেও আর্তত্রাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। এই পদটির মধ্যে বিশেষ করিয়া সহজিয়াধর্মী কোন কথা নাই।

১০

শুনইতে ধাই লছিমা তব আয়ল[১]
নৃপতি সহিত তব কহই[২]।
কিয়ে ভেল দৈব কিছু নাহি সমঝলুঁ[৩]
চমকিত হই তাহা রহই[৪]॥

বান্ধব হে অব কি করব প্রতিকার[৫]।
উৎকণ্ঠিত বদন এবে ফুকরই
বোলত বারাহি বার[৬]॥
তাকর বিরহ বিচ্ছেদ যবে বাঢল
পুন পুন ফুকরই জান।
লছিমা পড়লহি সোই শূন্য পর
ধায়ল রূপনারায়ণ[৭]॥
চারু চতুর পডল যব শূন্যে
তাঁহি রাধামাধব করু গান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
কবি বিদ্যাপতি ভান[৮]॥ (১০৯৬ সালের পুথি)

পাঠান্তরঃ ১ শুনইতে লছিমা ধাই আয়লি। (১২০০) শুনইতে লছিমা ধাই তথা আওল। (বৃ); ২ নৃপতি সহিত এক হই। (১২০০); ৩ জানল। (১২০০) জানলুঁ। (বৃ); ৪ চমকিত তাহারি হোই। (১২০০) চমকিত হোই তাহা রহই। (বৃ); ৫ বান্ধব তব কিয়ে হব প্রতিকার। (১২০০); ৬ ইথে কঠিন বচন তব হরি হরি ফুকরি কহই বারে বার॥ (১২০০) শুনইতে কঠিন বচন ফিরব হরি হরি কহে বারে বার॥ (বৃ); ৭ শূন্য যে নৃপতি লছিমা তব পডলহি সঙ্গহি রূপনারায়ণ॥ (বৃ) শূলশেল মে নরসিংহ লছিমা পডতহি ধাওল রূপনারায়ণ॥ (১২০০); ৮ চারু চরহি পডল শূলে তঁহি রাধামাধব করু গান। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা কবি বিদ্যাপতি গান॥ (১২০০)

চারি চতুরহি পডল শূল তহি
রাধামাধব করি গান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী তব মান॥ (বৃ)

বৃন্দাবনের পুথিতে এই অংশের পর অতিরিক্ত পাঠ—

শিশু সহ হাম চললু পাঠ পড়াইতে
পড়িয়া সাধলু পাঠকার্য।
উপনীত সাধ্য করিতে সব ভৈ গেল
বারই উঠয়ে অকার্য॥

হেনই সময়ে ঘোর বরিষণে
কেহ কারে চিনিবারে নারি।
নানা রসভাব নিলাপে সভে বঞ্চয়ে
রজনী গেও আধ উতারি॥
গ্রামহি বাহির শশ্মান পর সরোবর
তাহে ভেল তিন দিন শূলে।
নরপতি চোর মারল সো সমাই
আর কেন চলু ভছু কূলে॥
সাহস ভরসা জীবন বলবিক্রম
ধন্য পুরুষ বর সোই।
কো জানে হামারি মনহি নিবারণ
ত্রিজগতে না জানই কোই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ নরপতি
লছিমা দেবী পরমাণ।
হামারি হৃদয় কোই নাহি জানত
এই শূলে মরম সন্ধান॥

এতক্ষণ পর্যন্ত শূলের গল্পটি কোন রকমে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছিল। কিন্তু এই পদে পৌঁছিয়া একেবারেই অচল হইয়া গেল। যদি চোর বিদ্যাপতি শূলে বসিয়াই বর্ণনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে আবার লছিমা কেমন করিয়া তাঁহার করুণ প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে রাজার সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কথাই বা লিখিবেন কি করিয়া। বিদ্যাপতি শূলে চড়িয়া জীবনের শেষ মুহূর্তে উপনীত হইয়াছেন বুঝিলেন এবং সেইজন্য ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আবার তাঁহাকে দিয়াই পারিপার্শ্বিক ঘটনার বর্ণনা করানো একেবারেই অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত। শুধু ঘটনার বর্ণনাই নয়। পদের মধ্যে লছিমা তাঁহাকে কি বলিলেন, তাহাও 'বিদ্যাপতি ভণ' বলিয়া বলা হইতেছে। কি যে হইয়া গেল কিছুই বুঝিলাম না। হে বন্ধু, এখন আর কি প্রতিকার করিব। এইভাবে তিনি উৎকণ্ঠার সহিত

বারবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন। শুধু তাই নয়, এরূপ বলিতে বলিতে রানীর বিরহ কথা যখন আরও বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি বিদ্যাপতি যে শূলে গাঁথা ছিলেন সেই শূলের উপর পড়িয়া গেলেন। সাধারণ ঘটনা হইলে আকস্মিক এই ভারের চাপ পড়াতে বিদ্যাপতির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শূল বাহির হইত। কিন্তু যেহেতু তিনি সহজিয়া বিদ্যাপতি, সেইজন্য তিনি অকুতোভয়ে এবং অবলীলাক্রমে পদ বাঁধিতে বসিলেন। পদের শেষাংশের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, রূপনারায়ণ শিবসিংহ রানীর পরকীয়া প্রেমের মহিমা দেখিয়া নিজের শূলের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং সেই সময়েও বিদ্যাপতি এবং শিবসিংহ রাধামাধবের নাম গান করিতে লাগিলেন।

দণ্ডার্হ কার্য কবির যে সুপরিকল্পিত ছিল না—সহসা বর্ষার দুর্যোগে লছিমাকে রানী বলিয়া চিনিতে না পারিয়া ঘটিয়া গিয়াছে,—এই অজুহাত যেন কবি এখানে উপস্থাপিত করিতেছেন। তিনি বলেন যে, শিশু পড়াইতে পাঠশালায় গেলেন এবং সেখানে নিজেও কিছু পড়াশুনা করিলেন। এমন সময়ে লছিমা [সাধ্য] সেখানে উপস্থিত এবং সেই সময়ে ঘোরতর বাদল নামিল। সেইজন্য তাঁহাকে চিনিয়া উঠা গেল না এবং 'অকার্য' ঘটিল। তারপর রসালাপে অর্ধ রাত্র কাটিয়া গেলে, তিনি ধরা পড়িলেন এবং রাজা তাঁহাকে শূলে চড়াইলেন। এইবার তিনি শূলে বসিয়া রাজার সাহস, বিক্রমাদির স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার মনের কথা কেহই জানে না, তাঁহার হৃদয়ে যে কি তাহা লছিমা দেবীই একমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারেন। কিন্তু এখন হৃদয়ে শূল-সন্ধান ছাড়া আর কিছুই নাই।

[এই পদটির পর ১০৯৬ সালের পুথিতে গোবিন্দদাসের 'প্রেমকি অঙ্কুর জাঁত জাঁত ভেল' বিখ্যাত পদটি বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের যুক্ত ভণিতায় রহিয়াছে। এই পদটি ক. বি. ৩৭৪৭ পুথিতেও এইভাবে আছে। বৃন্দাবনের খাতায় গোবিন্দদাসের এই পদটি নাই। দশম পদটির পরেই পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদটি আছে।]

১১

তুহুঁ যদি যাওবি   চিহ্ন কিছু দেওবি
জগজন পরতীত হোই।
ইথে যদি দেব   ঘটয়ে তোহে তৈখনে
মধু পান সহ নাহি দায়॥
করে এক অস্ত্র   উপল কম্বল তাহ
ক্ষেপণ করল শূণ দণ্ডে।
এক পদ ফিরিতে   গমনে পুন ডাকয়
বাজ পড়ল যেন মুণ্ডে॥
অপরূপ যুবতী   বহুত করি সাধন
ভাঙ্গল মনভয় ভাব।
দেওল মন্ত্র   কহল প্রকৃতি তনু
হেরলু কিছুই না ভান॥
হোর প্রকৃতি তনু   ঈষদ ভঙ্গিম নমু
ইহ প্রতি আধ দেবা
নিন্দিত যুবতী   বামপদ অঙ্গুলী
বিহি নিষ্ঠীত কাম দেবা।
সঙরি সো মন্ত্র   দাক্ষিণ কর দাবলী
রমণী কোটি সুখ কাজ।
ইহ উপদেশ   কহল সো কামিনী
পুরব কাহিনী শুন রাজ॥
নিরখলু নারী   বিহি করি বর্ণন
বিদিত লছিমা বটে সোই।
তুয়া লয়ে তিন   পুরুষে শুন রাজন
ত্রিজগতে না জানয়ে কোই॥
লছিমা বিদ্যাপতি   সহজ পিরিতি
যদি পুছলি ভূপরাজ।
মরণ কালেতে   খেদ না মিটল
শেল রহল হৃদি মাঝ॥   (বৃন্দাবনের খাতা)

শূলদণ্ডে কবি যখন মুমূর্ষু তখন যেন লছিমা বলিতেছেন যে, তোমার পরলোকগমনের পূর্বে এমন কিছু নিদর্শন দেখাইয়া যাও, যাহাতে জগৎ ন প্রতীত হয় যে, তোমার কোন দোষ নাই। এরূপ করিতে যাইয়া যদি কোন বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে সেজন্য রানী দায়ী হইবেন না। তিনি একখানি অস্ত্র শূলদণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর এক পদ ফিরাইতেই দেখিলেন যে, এক অপরূপ যুবতী সেখানে উপস্থিত। তাহাতে তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। অনেক সাধ্যসাধনার ফলে যুবতীর ভয় ভাঙ্গিল এবং তিনি লছিমাকে মন্ত্র দিলেন। সেই মন্ত্র স্মরণ করিয়া দক্ষিণ করে চাপ দিয়া লছিমা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। বিদ্যাপতির সাধন-প্রভাবেই ঐ নারী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি, লছিমা রাজা শিবসিংহ ও বিদ্যাপতি ছাড়া আর কেহ এই ঘটনা জানেন নাই বা শোনেন নাই। তাই কবি বলিতেছেন–

হে রাজন, তোমাকে লইয়া তিনজনে এ-কথা জানিল, আর কেহ জানে না। এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যাপতিকে পুরুষ ধরিয়া রানীর সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ সন্দেহ করা অনুচিত। কেননা, কবি স্বরূপতঃ প্রকৃতিই। নারীর সহিত নারীর সৌহার্দ্য দোষনীয় নহে। তাই তিনি বলিলেন -'লছিমা বিদ্যাপতি সহজ পিরিতি।'

পদটির রচক হিসাবে কাহারো নাম উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি বিদ্যাপতির উল্লেখ লক্ষণীয় প্রসঙ্গত, পদটিতে লছিমা ও বিদ্যাপতির 'সহজ পিরিতি' মূলক এই আখ্যায়িকাটি গ্রথিত হইয়াছে। ইহা যে সহজিয়াগণেরই সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই

১২

শূলক মাঝে পড়ল পাছে তিন জন
হোয়ল চরক সমান।
গোকুল নায়ক হৃদয়ে ধ্যান করি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করু গান ॥

হরি হরি কিয়ে ভেল দৈব কি রীত।
মন্ত্র প্রেম লাগি প্রাণ সমপিলুঁ
তুহুঁ না করবি বিপরীত ॥
চারুজন মেলি চারুক নিরখত
কাতরে প্রেম নয়ান।
মাধব প্রীত দণ্ডায়ল মনমথিঁ
উ বামা কোই না জান ॥
প্রেম কি চিহ্ন রাখল পহু জগজনে
ঐছন কবহু না তায়।
বিদ্যাপতি মোগি হরি হরি বোলত
কাম স্মরণ নিল তোয় ॥
শূলের পদ সমাপ্তঃ (১০২৬ সালের পুথি ও ৩১৪৭ ক. বি.-র পুথি

বিদ্যাপতি, তাঁহার সৃষ্ট নারী, লছিমা ও শিবসিংহ—এই চারিজন পরস্পর পরস্পরকে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন এবং মনে হয়, তাঁহারা সকলেই প্রাণে বাঁচিলেন। ইহা দ্বারা গানের মধ্যে প্রভু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন প্রেমের চিহ্ন রাখিয়া গেলেন

শূল প্রসঙ্গের আরও একটি নূতন পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১৪৯ পুথিতে পাওয়া যায়। পদটি নিম্নরূপ ঃ—

১৩

শূলে পড়ল কবিরাজ।
শুনি ধায়ল মহারাজ।
বামে হাথে দীপক উজোর
দেখল বিদ্যাপতি চোর
কহে নৃপ শিবসিংহ রাজ।
কিভ ভেল দারুণ লাজ।
শুনে কবি শেখর ভাণ।

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেই পরমাণ ॥
(ইতি ১১৭০ সাল, তাং ২৩ ভাদ্র বুধবার)

এই পদটি সম্ভবত শূলের পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরে কেহ ইহা বসাইয়া দিয়াছেন। এই পদের অনুসারে ঘটনার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আঁধারে বিদ্যাপতিকে অবৈধ কার্যে লিপ্ত দেখিয়া রাজা তাঁহাকে শূলে চড়াইয়াছিলেন এবং পরে মশাল হাতে করিয়া আসিয়া দেখিলেন, দণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাপতি ছাড়া আর কেহই নন। তাহাতে রাজার মনে বড়ই লজ্জা উপস্থিত হইল। এই পদটিতে যে বিদ্যাপতির নিজের নামে ভণিতা নাই, তাহা উপযুক্ত হইয়াছে ; কেননা. শূলদণ্ডে মৃত হওয়ার পর নিজের ভণিতায় পদ রচনা করিতে পারেন না।

এই পদটির রচয়িতা স্পষ্টরূপেই 'কবি শেখর'। যদিও রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এবং লছিমা কেহই দূরে নাই। এই পুথিটির কাল নিরূপণ করিলে কীর্তনানন্দ [১৭৬৬] ও পদকল্পতরু [১৭৮০] অপেক্ষাও যে প্রাচীন, তাহা বলা বাহুল্য। ১০৯৬ সালের পুথি সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

লছিমা-বিদ্যাপতির এই আখ্যায়িকা কেন্দ্র করিয়া আরও একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। অপ্রকাশিত পদটিতে পূর্বালোচিত ১১-সংখ্যক পদের সঙ্গে ভাষাগত কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। বিদ্যাপতির 'শয়নে সপনে' লছিমা নামের প্রভাব সহজিয়াগণ কিভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা লক্ষণীয়।

পার লিখি যে আন পরিচর্যাং
ইসদ হহোই প্রকৃতি অধিদেবী।
নিভৃতে যুবতী বামপদ অঙ্গুলি
বৃহাখতে ব্রতী কামদেবী ॥

সওরি সো মন্ত্রে দক্ষিণ পদ দাবরি
রমণ কোটি সুখ কাজা।
এই উপদেশ কহল মোহে কামিনী
অপূর্ব কাহিনী শুন রাজা ॥

নিরখনে নারী বিনহি বারি
বর্ণনে বিদিত লছিমা বটে সোই।
তোমা লইতেন বিদিত গুণ রাজন
ত্রিজগতে না জানয়ে কোই ॥
লছিমা বিদ্যাপতি সহজ পিরিতি
রতি পুরু নিজ বভুপ রাজ।
মরণ কালে কহি খেদ না পুরয়ে
শেল রহল হৃদি মাঝ ॥
দিবসে সতত স্বপনে লছিমাগত
শয়নে স্বপনে তছু নাম।
রতিরসে রভস বিদ্যাপতি বোলসে
তৈছনে শিথিলিত কাম ॥ (ক. বি. ৬২০৪, পদ ২১১২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় যখন বিরাট পদ-সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শূলের অন্য ১২।১৩টি পদ না ধরিয়া কেবলমাত্র একটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতেও মন্ত্রের কথা, বাম পদের অঙ্গুলি চাপার কথা, দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি চাপিলেও যে রমণ-কার্য অপেক্ষা শতগুণ সুখ হয়, তাহা বলা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সহজিয়াগণ লছিমা-বিদ্যাপতির এই আজগুবি কাহিনীটি রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার দুইশত বৎসর পরেও আধুনিক কালের সংকলক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ইহার প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথির লিপিকার ও সংকলক।

চণ্ডীদাস ও রজকিনীকে লইয়া সহজিয়াগণ তাঁহাদের ভাব ও সাধনা তথা কাব্য-সাধনাকে দীর্ঘকালব্যাপী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ঠিক সেই-ভাবেই তাঁহারা বিদ্যাপতি-লছিমাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী রচনা করিতে গিয়া যুক্তি বা ঘটনার পারম্পর্য তাঁহারা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। শূলের উপরে থাকিয়াও কবি পদ রচনা করিয়াছেন। আবার, কবির সহজ স্বীকারোক্তিও নানাভাবে আদায় করিয়া লওয়া

হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পদগুলির সহিত মৈথিল কবি-সম্রাটের রচনার কোন সাদৃশ্যই নাই। সহজিয়া সাধকেরা বিদ্যাপতির নামে ঝুলিতে আপনাদের কল্পনাশ্রয়ী কবি-কর্ম তুলিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই পদসমূহ নিঃসন্দেহে বাঙ্গালীরই সৃষ্টি। কিন্তু তাঁহারা সাদা বাংলা ভাষা ব্যবহার না করিয়া, প্রচুর ব্রজবুলি প্রয়োগের দ্বারা পাঠকের চিত্তে ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

দুই

সহজিয়া সাধকগণ বিদ্যাপতিকে শুধুমাত্র লছিমার সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়াই থামেন নাই, তাঁহারা বিদ্যাপতিকে সহজসাধনারই কবিরূপে চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছেন। সহজসাধনার ভাবকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পদ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতা সংযুক্ত করিয়া মৈথিল কবিকে সহজিয়া কবিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই দিক হইতে সহজিয়া সাধকগণের কিছু সুবিধাও ছিল। বিদ্যাপতির রচিত ১৪টি পদে [মি.-ম. সংস্করণের ৬, ১৬, ২০৪, ২০৫, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৯০, ৫৯১, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২] পরকীয়া নায়িকার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরকীয়া নায়িকার বর্ণনা করা এবং সহজসাধনার কথা পদমধ্যে বর্ণনা করায় বিভেদ দুস্তর। সহজিয়াগণ বিদ্যাপতির কবিকণ্ঠে সহজ ভাবের ঝুলি পরাইয়া দিয়া, তাঁহাকে সহজসাধনার প্রচারকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। এ পদগুলি যে কোনভাবেই মৈথিল কবির রচনা হইতে পারে না—সম্ভবত এই বিশ্বাসেই বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত নিছক সহজভাবের পদগুলি এ পর্যন্ত কোন সংকলন-গ্রন্থে স্থান পায় নাই। ডক্টর সুকুমার সেন 'কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ' নামক প্রবন্ধে [সা. প. প. ১৩৪১।৩] বিদ্যাপতি ভণিতার ৭টি পদ প্রকাশ করেন। ঐ ৭টি পদ ছাড়াও, আমি আরও ১১টি অপ্রকাশিত নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছি। পদগুলির বক্তব্য প্রায় এক ;

সেইজন্য এগুলির উপর পৃথক আলোচনা না করিয়া নিম্নে শুধুমাত্র উদ্ধৃত হইল। প্রয়োজনবোধে কয়েকটি পদের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদসমূহের প্রথমে ডক্টর সেনের ৭টি এবং পরে আমার সংগ্রহের ১১টি পদ দেওয়া আছে।

১

মানুষ মানুষ কহিলে কি হবে
না জানি মানুষ রীতি।
মানুষ যে জন স্বতঃসিদ্ধ হন
কে জানে তাহার রীতি॥
মানুষের সঙ্গ যে জনা লইয়া
না করে মানুষাচার।
উঁচাতে উঠিয়া পড়িয়া মরএ
না হয় বিরজা পার॥
গোলক উপরে মানুষ বসতি
তাহার উপরে নাই।
মানুষ ভাবেতে যে জন ভজএ
সেজন মানুষ পাই॥
সহজ ভাবেতে মানুষ ভজন
লোকে কহে কুবিচার।
বিদ্যাপতি কহে এমন হউক
আমি নাহি চাহি আর॥

যথার্থ মানুষ যিনি তাঁহার স্থান 'গোলক উপরে'। মানুষের অপেক্ষা উচ্চস্থান আর কাহারো নাই। প্রসঙ্গত, চণ্ডীদাসের মঞ্জরী-ভাবাশ্রিত বিখ্যাত পদটির কথা মনে পড়ে।

চণ্ডীদাস কহে, শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই॥
(চণ্ডীদাসের পদাবলী—মজুমদার সম্পাদিত : পৃঃ ১৮)

আলোচ্য পদটিতে সাধনার কথাও বিবৃত হইয়াছে। 'বিরজা'র কথা কবি বর্ণনা করিয়াছেন। এই পদের রচয়িতা নিজেকে বিদ্যাপতি বলিলেও, তিনি যে মৈথিল বিদ্যাপতি নহেন তাহা অনস্বীকার্য।

২

ভরত মুখেতে শুনি ভগবান
সহজ মানুষ কথা।
মানুষ আকৃতি মানুষ প্রকৃতি
ভরত মুখেতে গাঁথা ॥
সব পরিজন লয়্যা সঙ্কর্ষণ
সহজ মানুষ হল্যা।
সহজ রূপেতে সহজ মানুষ
আস্বাদন সভে কৈলা ॥
এমতি করিয়া মানুষ ভজহ
সহজ মানুষ ভাই।
বিদ্যাপতি কহে এমন জানিহ
ইহার পরেতে নাই ॥

ভগবান এবং মানুষকে এক করিয়া প্রচলিত শাস্ত্র-ধারণার পটভূমিকায় কবি সহজভাবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

৩

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ প্রকার
মানুষ বাছিয়া লই।
সংসিদ্ধ মানুষ অযোনি মানুষ
সংস্কার মানুষ যেই ॥
সংস্কার জেই ব্রহ্মাণ্ডের সেই
সামান্য মানুষ নাম।
অযোনি মানুষ গোলকের প্রতি
নিত্য স্থানে যার কাম ॥

তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলাকারী যার নাম।
সকল উপরে দিব্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ ধাম ॥
আনন্দ মোহন এই দুইজন
দুঁহে দুঁহা জানে রীত।
বিদ্যাপতি কহে সেজন বুঝিবে
ইহাতে যাহার চিত ॥

এই 'দিব্য বৃন্দাবন' চণ্ডীদাসের সহজসাধনার পদে 'নব বৃন্দাবন'-রূপে ধরা দিয়াছে,—

ধারার দুয়ারে নলিনী দলে।
নব বৃন্দাবন তাহারে বলে ॥
সে রতি তাহার প্রভাব হয়।
মঞ্জরী রতি চণ্ডীদাসে কয় ॥

(ক. বি. ৬৪৩৬ ; জে. এল. ১৯২৮ পি. ৩১ : মজুমদার-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃঃ ১৯)

মঞ্জরী-ভাবাশ্রিত চণ্ডীদাসের উপর্যুক্ত পদটির সম-পর্যায়ের পদ হইল বিদ্যাপতির পদটি। আসলে সকল সহজিয়াই একই ভাবের ভাবুক। সেই ভাবনার চিহ্ন বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৪

সহজ ভাবেতে সহজ ভজন
যে জন সহজ হয়।
সহজাস্বাদন করে যেই জন
সেই সে সহজময় ॥
সহজ এ দেহে কেবল জানএ
বিকার নাইখ মনে।
সহজ প্রমাণ ব্রজগোপীগণ
আস্বাদে সহজ মনে ॥

সহজ নাম বিরল ধাম
সহজ যাহার রীত।
সহজ করিয়া যে জন জানএ
বিকার না হয় চিত॥
সহজ আকৃতি সহজ প্রকৃতি
এই দেহে যেবা জানে।
সহজের সনে বিদ্যাপতি ভণে
এই সার মোর মনে॥

৫

মানুষ মানুষ সবাই বলএ[১]
মানুষ নিগূঢ় কথা।
কেমন মানুষ কিবা প্রেম রস
মানুষ বসতি কোথা॥
পীরিতি সায়রে তাহার মাঝারে
তাহার নিকটে সেই[২]।
বসতি জানিয়া মানুষ বসতি
তবে সে পাইবে সেই[৩]॥
বেদ বিধি পার বেভার আবার
বেদ বিষ্ণু নাহি জানে।
[৪]মানুষের তত্ত্ব অতি অদভুত
কেবা কহে কেবা জানে॥
মানুষ চরিত্র অতি বিপরীত
যে জানে সেই সে জানে[৪]।
সকল জগত করে আনন্দিত
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪, ২৩৮৩-সংখ্যক পুথিতে এবং বরাহ ২৬ (ঙ) এবং ২৬ (ব) পদটি আছে। ক. বি. ২৩৮৩ পুথির এবং পাঠান্তর পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল :—

বরাহ (ব) পুথির **পাঠান্তর**ঃ ১ মানুষ ভজন করএ যে জন; ২ তাহার নিগূঢ় ভজে; ৩ বসতি জানিলে মানুষ হইবে মানুষ পাইবে সে॥ ৪—৪ অতিরিক্ত পাঠ।

৬

সহজ কথাটি সুন গো সই।
সহজ পিরীতি ভজন এই॥
নিজ দেহ দিয়া সেবিতে পারে।
সহজ পিরীতি কহিএ তারে॥
সহজ রসিক করএ প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত॥
সহজ মানুষ দেহেতে সেবে।
সে পুন রসিক জগত মাঝে॥
সহজ মরমে মজিল যারা।
পিরীতি ভজন বুঝিল তারা॥
সহজে নাগর নাগরী হল্যে।
সহজে পিরীতি না ছাড়ে মল্যে॥
সহজ মরমে যে হল্য রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
বিদ্যাপতি কহে সহজ রীত।
বুঝিয়া নাগরী করিবে প্রীত॥

৭

পদ্ম বিনা ভ্রমর চম্পকে মধু পিএ না।
বিশেষ রসিক জন রস বিনা জিএ না॥
বিশেষে রসিকের কথা বড়ই মধুর।
ছিড়িলে না ছিঙ যায় মৃণালের সুত॥
বিবাহ বিচ্ছেদ ভাই[১] নহে চিরদিন।
আগুনে কাঞ্চন যেন না হয় মলিন॥
ইক্ষুক মধুর কত না যায় ছেদনে।
এমতি জানিবে ভাই সুজনের মনে॥

দু জনে সুজন হয় তবে জানি প্রেম।
পোড়ায়্যা ঝোড়ায়্যা যেন সোহাগেতে হেম॥
বিদ্যাপতি বলে ভাই সাবধান হয়্য।
বচনে বিষম বড় বুঝ্যে কথা কয়্য[২]॥

বরাহ ২৬ (ঙ) পুথির পাঠান্তরঃ ১ বিবাদ বিরোধ কভু। ২ পিরীতি বিষম জালা জাগ্যে শুত্যে করও॥

৮

লছিমা আমার স্বরূপের গুরু।
তাহার চরণ কল্পতরু॥
লছিমা আমার নঞান কোনে।
অনুরাগ রাখি সদাই মনে॥
শয়নে সপনে সকলি সে।
তাহারে সঁপ্যেছি আপন দে॥
চরণে শরণ লয়্যেছি আমি।
যা কর তা কর লছিমা তুমি॥
ও দুটি চরণ সেবিব ভাবে।
হেন দিন মোর হইব কবে॥
কহে বিদ্যাপতি এই সে মন।
উপাসনা মোর লছিমা ধন॥ [বরাহ ২৬ (ঙ) পত্র ৪]

৯

এ হরি মাধব কি কহিব আন।
একটি আঁখরে সোপিল প্রাণ॥
তোয় মোয় না বাশীর আন।
দেওবি দুই আঁখির দান॥
সেই দুই আঁখির চিন।
সিরে ন পটায়রি আঁখর তিন॥
চারি আঁখরে না করিবি মান।
পাঁচ আঁখরে না শুনিবি কান॥

ষট আঁখরে না হোবি ভোর।
কবি বিদ্যাপতি গুণ গায় তোর ॥

[বরাহ ২৬ (ঙ) পত্র ৪]

১০

জলের উপর আনন ভাসন
আগুনে মেঘের ছটা।
মেঘের উপরে তারার উদয়
মাঝারে রবির ছটা ॥
হরিণে দেখিয়া বাঘিনী ডরায়
ব্যাধ পলায় দূরে।
সুমেরু শিখর সুতায় গাঁথনি
আকাশে পরিয়া ঘুরে ॥
আজ সে পরশ পরশে ছুঁইলে
অজসী তিমির কাঁতি।
নাগরি বচন নাগর বুঝএ
ইহা না বুঝিএ আন।
মুখের বচনে পণ্ডিত ভুলিল
কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ [বরাহ ২৬ (ঙ) পত্র ৭]

১১

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া দিয়ে।
গাভ্য কুটাগাছি শিরে ছোয়াইয়া
আনাই বানাই তার নিয়ে ॥ ধ্রু॥
হাথ দিয়া দিয়া মুখানি সাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্রে যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঁই না পায় ॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।

ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায় ॥
তাহার পিরীতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি গায় ॥

[বরাহ ২৬ (ছ) পত্র ৩৯৬]

এই পদটিতে চণ্ডীদাসের 'এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি' [১২৮, ১২৯ মজুমদার] পদদ্বয়ের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

১২

পিরিতির ঘরে পরাণ পসিল
পরাণের ঘরে চোর।
চোরের মন্দিরে চঞ্চল পশিল
তবু না পাইল ওর ॥
সখি হে, সরস কহিএ তোরে।
যাহার লাগিয়া ঘরে পলাইলু
সে জনা রহিল ঘরে ॥
আশার মন্দিরে মরম পশিল
মরম মন্দিরে ব্যাধ।
সুজন মন্দিরে কুজন পশিল
না ভৈল মনের সাধ ॥
সাধের মন্দিরে ব্যাধ পশিল
ব্যাধ মন্দিরে কি।
কহে বিদ্যাপতি এ বুঝিলে
তাহারে পরাণ দি ॥ [বরাহ ২৬ (ত) পদ ৩]

১৩

শুন প্রাণ পিয়া এক মন হইয়া
স্বরূপ বচন মোর।
চরণে ধরিয়ে কাতর হইয়ে
মিনতি করিয়ে তোর ॥

তোঙ গুণ মনি হাম অভাগিনী
তোহে কি কহব আর।
পিরীতি অনল মদন দহন
অব সে হইল সার॥
সে সুখ সময়ে ছিলে অগেয়ান
এবে সে হইল দুখে।
তোমার বিরহে জীবন না রহে
তেজিনু সকল সুখে॥
কানু অনুভাবি বিদ্যাপতি কবি
এ সখি এই ন বানী।
জনমে জনমে পরবাসী মনে
পিরিতি করবি জানি॥ (ক. বি. ৬২০৪ ; পদ ১৭৮৬)

১৪

মানুষ বলিয়া কেমনে জানিব
কেমন তাহার নাম।
কেমন আচার কেমন বিচার
কেমন তাহার ধাম॥
সামান্য মানুষ সাধিতে সাধিতে
সহজ মানুষ হয়।
আরোপ করিঞা মানুষ হইঞা
মানুষ ধামেতে রয়॥
আরোপ বলিঞা কেমনে জানিব
ইহারা কেমন হবে।
কৃপাসিন্ধু গুরু তাঁহার কৃপায়
মানুষ দেহটি পাবে॥
সখির সঙ্গে সেবাদি করণে[১]
ইহা সে[২] জানিল জারা।
ভণে বিদ্যাপতি এ তিন ভুবনে
সমাধি[৩] সাধিল তারা॥ (ক. বি. ৬২০৪ ; পদ ২৪০৪)

ক. বি. ৪৪৭৫ পুথির পাঠান্তরঃ ১ সখীর সতিনী হঞা সে বাধি সাধিল ; ২ এ তত্ত্ব ; ৩ সারথি।

এই পদটিতে সহজিয়াদের সাধন-পদ্ধতির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সহজিয়াগণের 'আরোপ'-তত্ত্ব এবং 'কৃপাসিন্ধু গুরু' ও সর্বশেষ 'সমাধি'-র কথাই এই পদের মূল বক্তব্য। আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত সহজিয়াগণের আরোপ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—The realisation of the true nature of man as Krishna and that of woman as Radha is technically known as the principle of aropa or the attribution of divinity to man. (Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature, P. 155)

চণ্ডীদাসের পদেও এই আরোপ-তত্ত্বের কথা দেখা যায়। যেমন—

'ছাড়ি যপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।'

কিংবা,— 'ইহার করণ জানে যেই জন, স্বরূপে আরোপ রয়।
সদ্ গুরু কৃপায় জানিলে কারণ, সিদ্ধ বস্তু প্রাপ্ত হয়॥'

যে কবির নামেই পদ রচিত হউক না কেন, সকল সহজিয়াগণেরই বক্তব্য এক। বিদ্যাপতির ভণিতায় তাঁহারা আপনাদের মতের প্রচারকেই মূল লক্ষ্য ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

১৫

মানুষ মানুষ নিগূঢ় কথা।
কেমন মানুষ কিবা প্রেম রস
মানুষ বসতি কোথা॥
পিরিতি সায়রে তাহার মাঝারে
তাহা নিগূঢ় যে।
বসতি জানিলে মানুষ হইবে
মানুষ পাইবে সে॥
বেভার আচার দেবেরে সুজানো
মানুষের তরে।

মানুষ চরিত অতি অদভূত
যে জানে সেই সে জানে।
সকল জগত করি অনহিত
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥ [বরাহ ২৬ (ব)]

এই পদটির সঙ্গে পঞ্চম-সংখ্যক পদটির সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৬

হে সখি[১] হিত বচন কিছু শুন।
পরোপকারে বহুত বহুত গুণ[২]॥
যে ধনি না জানে পুরুষের সুখ[৩]।
সপনে নাহি হেরি তাহারি সুখ[৪]॥
পঞ্চ পুরুষের সুখ নাহি জানে যেই।
ভূত প্রেত পিশাচিনী সেই॥
ভণএ বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেম না জানত[৫] এক ভাতারী[৬]॥ [বরাহ ২৬(ত) পত্র ৩]

এই পদটি বরাহনগর ৬-ক, ২৬-ঙ এবং সাহিত্য পরিষদের ১৮৩-সংখ্যক পুথিতেও আছে।

বরাহ ৬-ক পুথির পাঠান্তর: ১ সুন্দরি। ২ পর উপকার করয়ে বহু গুণ॥ ৩ যো না জানত পর পুরুষ কি সুখ। ৪ প্রাতে না হেরই তাকর মুখ॥ ৫ জানই, ৬ এ রসে বঞ্চিত এক ভাতারী। [সা. প. ১৮৩ পুথির পাঠান্তর]

১৭

পরকীয়া রতি কেমন বরণ
কেমন তাহার দেহা।
পরকীয়া স্থান গঠন কেমন
কেমন সেখানে নেহা॥
বিনাসের রতি কোথা সে বসতি
সুখ রতি কোথা রয়।
কটাক্ষেতে সে কেমনে উদয়
কেমন বরণ হয়॥

সাধনের রতি উদয় হইলে
সেখানে এরূপ হয়।
সাধনের রতি উদয় হইলে
পিরিত আসিয়ে রয় ॥
রতিভেদ তত্ত্ব জানিব কেমতে
কেবা সে করিবে দয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৃপা করি দিল
লছিমা চরণে ছায়া ॥ (ক. বি. ২৩৮৩)

১৮

গোপত পিরিতি রস বেকত হোই।
টুটত ইহলোক পরাণ দুহে খোই ॥
তবহু পিরিতি দোঁহাক তনু এক।
মঙ্গল দেয়ত মরণ বিরহেক ॥
ভণ এ বিদ্যাপতি ভূপতিক সাধ।
লিখয়ে লছিমা উপপতি পাত ॥ (ক. বি. ২৩৮৩)

১৯

নগর ভিতরে আছে এক রসের মন্দির।
বৈধী-ভক্তি-আচরণ গড়ের প্রাচীর ॥
জ্ঞানযোগ কর্মকাণ্ড গড়ন বিভিতে।
তাহা না লঙ্ঘিলে পুরী নারি প্রবেশিতে ॥
সেই গড়ের চারি দ্বারে চারি সরোবর।
চারি কল্প বৃক্ষ আছে তাহার ভিতর ॥
দ্বারে দ্বারে কপাট তার আছে কুঞ্জিতালা।
নির্বিকার শরীর যাব সেই দেখে খেলা ॥
কিঞ্চিৎ বিকার যদি আকারে শরীরে।
চড়িয়ে উত্তম পথে সিঁড়ি হইতে ফিরে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক ভক্ত না বুঝয়ে মূঢ় ॥ (ক. বি. ৩৪৩৬)

মনীন্দ্র বসু 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে এই পদটি গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত ১৯টি সহজিয়া পদ আর যাহাই হউক, ভাব ও ভাষার প্রতি একটুও যাঁহারা নজর দিবেন তাঁহারা কখনই এগুলিকে মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলিবেন না। শ্রীখণ্ড অঞ্চলে যে তান্ত্রিক বৈষ্ণবতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহারই প্রকাশ সহজিয়া পদসমূহে বিদ্যমান। বিদ্যাপতির ভণিতা দিয়া সাধক-কবি আপনার সাধনার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। "সুতরাং 'বিদ্যাপতি' ভণিতাযুক্ত সহজসাধন-ঘটিত পদগুলির রচয়িতা যে জনৈক বাঙ্গালী-বিদ্যাপতি, ইহা আপাততঃ অনুমান করিতে বাধা নাই"। [সা. প. প. ১৩৪৭] ডঃ সুকুমার সেনের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। তবে এই সহজিয়া পদগুলি এক বা একাধিক কবিগণের রচনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তথাপি একই কবি-চেতনা হইতে এই পদগুলির জন্ম তাহা অনস্বীকার্য।

॥ চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন-প্রসঙ্গ ॥

সহজিয়া সাধকগণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবি-গণের কণ্ঠে সহজিয়া ভাবের ঝুলি পরাইয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনীর প্রেম এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে লছিমার প্রেমমূলক কিংবদন্তী তাঁহারাই সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে, অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা এই দুই কবিকে তাঁহারা বিশেষভাবে সহজিয়া ভাবে বাঁধিতে চাহিয়াছেন। ইহারই ফলস্বরূপ চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির মিলন-প্রসঙ্গ রচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই মিলনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি এ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। পদকল্পতরুতে এই মিলন-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে ২৩৮৯—২৩৯৪-সংখ্যক ছয়টি পদে। তন্মধ্যে একটি রূপনারায়ণের ভণিতায়, দুইটি বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং তিনটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। শেষের তিনটি পদ মিলন-সংক্রান্ত না হইলেও, 'অথ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসক মিলনং যথা' এই প্রবেশকের অন্তর্গত এবং এই ৬টি পদের পরেই পদকল্পতরুর এই পল্লবটি শেষ হইয়াছে বলিয়া, এগুলিকে মিলন-সংক্রান্ত বলা যায়। প্রথম তিনটি পদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ২৩৯০ পদে বিদ্যা-পতিকে কবিরঞ্জন বলা হইয়াছে।

চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুলক কলেবর গীর ॥

এই পদের ভণিতায়—

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জন
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহরস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥

নেপালে এবং মিথিলায় প্রাপ্ত কোন পদেই বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধির ব্যবহার নাই এবং 'লছিমা-পদ ধ্যান' করাও সম্পূর্ণ নূতন এই প্রসঙ্গে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন, "ঐ বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন উপাধিধারী সহজিয়া এক কবি এবং ঐ চণ্ডীদাসও একজন সহজিয়া। কেন না ২৩৯১-সংখ্যক পদে তাঁহারা কাম-সাধনার কথাই বলিয়াছেন,—

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ-কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥

দুইজন মহাকবি মিলিত হইয়া পুরুষ অপেক্ষা নারী যে রতিসুখ অধিক পায়, এই আলোচনা করিবেন, ইহা সহজিয়া ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন [চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃঃ ২৫]।"

এই মিলন-প্রসঙ্গে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' প্রবন্ধে [সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ১৩৪৬, ৩য় সংখ্যা] একটি নূতন তথ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"সম্প্রতি বাঁকুড়ার একখানি পুথিতে এই মিলন-প্রসঙ্গ আরও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে। পুথিখানি ক্ষুদ্র বইয়ের আকারের। হস্তলিপি প্রাচীন, কিন্তু এই লিপি দেখিয়া পুথির বয়স স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, ইহাতে লিপিকালের পরিচয় আছে। এক স্থলে ১১০৫, আর দুই স্থলে ১১০২ ও ১১০৩ আছে।

পুথিখানি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দেখিতে দিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উকিল শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পুথির স্বত্বাধিকারী। রামানন্দবাবু তাঁহারই নিকট হইতে এই পুথি এবং অপর একখানি পুথি আনাইয়া আমাকে দিয়াছেন। এই পুথিতে বিত্তাপতি-চণ্ডীদাস মিলন-প্রসঙ্গ আছে। উহাতে পদকল্পতরু-ধৃত প্রথম পদ ও শেষের তিনটি পদ নাই। তাহার স্থলে অন্য কয়েকটি পদ আছে। সেই পদগুলির কয়েকটিতে বিত্তাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে।...এই পদগুলি হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, কোন সহজিয়া লেখক বিত্তাপতি ও চণ্ডীদাসের গলায় তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছেন।”

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এবং অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র উভয়েই এই মিলন-বর্ণনাকে সহজিয়া কবিগণের সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অভিমতের সমর্থনে একটি নূতন পদ পাইয়াছি। পদটি একটি প্রাচীন পুথির ছিন্ন পৃষ্ঠা। পদের শেষে লিপিকারকের নাম হিসাবে আছে “দীনাতিদীন শ্রীবিষ্ণুদাস বৈরাগী, বনবাতাসপুর। বীরভূম।” লিপিকাল নাই। পুথির এই পত্রটি দিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের বাংলা পুথিশালার সংরক্ষক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র পাল। নিম্নে পদটি উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ

বিত্তাপতি কবি সিখরে বসি।
প্রেম সিন্ধু নীরে দোহাতে ভাসি॥
বিত্তাপতি কহে সো রূপ কে।
চণ্ডীদাস কহে সেখানে যে॥
বিত্তাপতি কহে এখানে কে।
চণ্ডীদাস কহে আশ্রয় যে॥
বিত্তাপতি কহে ভাবি কি।
চণ্ডীদাস কহে রজনী ঝি॥

বিত্তাপতি কহে প্রাকৃত হয়।
চণ্ডীদাস কহে মিছিলা নয়॥
চণ্ডীদাস তারে সাধক কয়।
বিত্তাপতি মনে আনন্দময়॥
সিবসিংহ রূপনারায়ণ যে।
বিত্তাপতি কবি লছিমা সে॥
চণ্ডীদাস রামী স্বরূপ সার।
সাধক সাধিতে নাহিক আর॥

পদটি যে সহজিয়া কবির রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পদটির প্রথম দুইটি ছত্র বিশেষ লক্ষণীয়। প্রেমসিন্ধুনীরে দুইজন ভাসিয়াছিলেন। এই দুইজন বিদ্যাপতি এবং কবিশেখর। অথচ চণ্ডীদাসের যত পদবীই থাকুক, তাঁহাকে কেহ কবিশেখর চণ্ডীদাস বলিবেন না। তবে কি বিদ্যাপতিই এখানে কবিশেখররূপে বর্ণিত হইয়াছেন? সেক্ষেত্রে দুইজন কবিকে একত্রিত করা যায় না। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন-জ্ঞাপক পদে বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জনরূপে দেখানো হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কবিশেখররূপে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং, এই পদটি উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা চলে না।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন-প্রসঙ্গ নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। তাঁহার 'The Story of Chandidas' গ্রন্থে 'The poet's Meet' অধ্যায়ে মদনের মাধ্যমে রূপনারায়ণসহ বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাস ও রামীর মিলন এবং তাঁহাদের সকলের কেন্দুবিল্ব ভ্রমণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সকল কাহিনীই জনশ্রুতি-নির্ভর এবং এই সকল আখ্যায়িকার কোন ঐতিহাসিক নির্ভর-ভূমিও নাই। সেইজন্য এগুলির উপর কোন আলোচনা করা যায় না। কি লছিমা-বিদ্যাপতির কাহিনী, কি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন-প্রসঙ্গ,—এ সকলই সহজিয়াগণের কল্পিত এবং তাঁহারা আপন আপন ভাব-সাধনার কথা ইঁহাদের ভণিতায় প্রচারিত করিয়া এই কবিদেরই আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছেন। কালের স্রোতে তাঁহারা ভাসিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার জগৎ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালবর্তী। কিন্তু যে পদগুলি তাঁহারা বহুখ্যাত কবিদ্বয়ের নাম-তরণীতে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও লুপ্ত হয় নাই। সহজ সাধক বাঙ্গালী কবিদেরই পদ বিদ্যাপতির নামে চলিত হইয়া 'সহজিয়া বিদ্যাপতি'র সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি আর যাহাই হউন, মৈথিল নহেন, নিতান্তই বাঙ্গালী কবি।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলায় বিদ্যাপতি-পদাবলীর রূপান্তর

এক

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন গর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য সকল যুগের সকল দেশের মানুষকে মর্ত্যসীমায় অমর্ত্যমহিমার সহিত পরিচিত করায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের বিস্ময়কর বিস্তার-পর্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যপূর্ব যুগে যাঁহারা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির কথা সর্বজনবিদিত। চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠক বিশেষ পরিচিত। এ সমস্যার সর্ববাদীসম্মত মীমাংসা এ পর্যন্ত হয় নাই। বিদ্যাপতি সম্পর্কে ঠিক এরূপ কোন সমস্যা আমাদের বিচলিত করে নাই। বিদ্যাপতির জন্মভূমি নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া একেবারে খাঁটী অবাঙ্গালী হিসাবে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া গিয়াছে। অন্যদিকে যে চৈতন্যপূর্ববর্তী তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। অতএব, পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, বিদ্যাপতি চৈতন্যপূর্ববর্তী মৈথিল কবি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইতে গিয়া দ্বিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এ 'দ্বিধা' নানা কারণে। নিতান্ত বিরূপতা সত্ত্বেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদ্যাপতির অস্তিত্বের কথা আমরা সহজেই জানিতে পারি। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই অন্যূন চারিজন বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদসমুদ্রে কবি বিদ্যাপতির কাব্যতরঙ্গ চিরকালীন রসের উৎস-কেন্দ্র। এ ক্ষেত্রেও পদকর্তা 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'র কথা অজ্ঞাত নয়। যাহাই হউক, বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন বিদ্যাপতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত না করিয়া মৈথিল বিদ্যাপতির পদ-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

বিদ্যাপতি ভণিতায় এ পর্যন্ত প্রায় নয় শতাধিক পদ প্রকাশিত

হইয়াছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ-গ্রন্থসমূহের মধ্যে মিত্র-মজুমদার-সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী [নূতন সংস্করণ, ১৩৫৯], সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কাব্য-প্রতিভার তুলনা নাই। সে-যুগের তিনিই যেন কবিরাজ-চক্রবর্তী, বিশাল পূর্ব-ভারত তাঁহার সাম্রাজ্য। তথাপি সেকালে নীতিধর্মী খণ্ড পদাবলীর রূপ সর্বদেশেকালে অবিকৃত রাখা সম্ভব ছিল না, এ-কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মিথিলা অপেক্ষা বাংলা দেশই কবি বিদ্যাপতিকে আপন অনুভবের কবিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি মিথিলার শাক্ত-গণ্ডির বাহিরে স্বতন্ত্র মহিমায় অপরূপ ভাস্বরতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তাঁহার পদগুলি অবিকৃত অবস্থায় আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত বিদ্যাপতির ভাবকে কেন্দ্র করিয়া কিংবা তাঁহার জনপ্রিয় পদের কয়েকটি ছত্রকে নির্ভর করিয়া নূতন নূতন পদ রচিত হইয়াছে এবং সেগুলিও বিদ্যাপতির ভণিতায় অদ্যাবধি তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। সে-যুগের কবিদের, বিশেষত বৈষ্ণব কবিদের, নিজ পরিচয়ে চিহ্নিত হইবার বাসনা ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু মহাজন কবির ভণিতায় আপন রচনাটিকে দীর্ঘজীবী করিবার বাসনা তাঁহাদের অনেকেরই ছিল। এবং সেই কারণেই কোন্ পদটি বিশেষভাবে কাহার রচনা, তাহা ভণিতা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়েই বলা চলে না। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অসংখ্য পদের মধ্যে এই ভিন্নতার স্পর্শ একটু সচেতন হইলেই লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতির ভাবের একটু তরঙ্গ, কিংবা তাঁহার ভাষার চকিত মুক্তির আভাষমাত্র অবলম্বন করিয়া কবিরা আপন কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা যে নিম্নমানের কবি ছিলেন, সর্বক্ষেত্রেই এ-কথা মোটেই বলা চলে না। বরং মাঝে মাঝে তাঁহাদের কবিত্ব-প্রকাশ অন্তহীন বিস্ময় ও আনন্দ লইয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যাপতির ভণিতা অবলম্বন করিয়া এরূপ কাব্যধারার প্রকাশ যে বহু- পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বৈষ্ণব

পদসংকলন-গ্রন্থ, 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র একটি পদ বিচার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বৈষ্ণব সংকলন-গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। অতএব, বাংলা দেশের এই প্রাচীনতম বৈষ্ণব পদসংগ্রহ-গ্রন্থের পাঠ-কে বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পাঠ-সমূহের মধ্যে প্রামাণ্য বলা চলে। এই গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ ক্ষণদায়, শুক্লা-অষ্টমী পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত পদটি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগ চিত্রণই বর্তমান পদের লক্ষ্য।

সহজই আনন, সুন্দর রে, ভাঙ সুরেখনি আঁখি।
পঙ্কজ মধুকর, পিবি মধু রে, উড়য়ে পসারল পাখী॥
আজু পেখলুঁ ধনী, যাইতে রে, রূপে রহল মন লাই।
কোটি সুধাকর, বদন-মণ্ডল, আঁখি তিরপিত নাহি পাই॥
অতএ ধাওলো, মেরি লোচন রে, যঁহি গেলি বর-নারী।
আশা-লুবধ, নাহি তেজই রে, কৃপণক পাছে ভিখারী॥
অতএ রহল মন, মো রহুরে, কনয়াকুচ-গিরি সন্ধি।
তে অপরাধে, মনোভব রে, জোরি রাখল মন বান্ধি॥ (বিদ্যাপতির পদ)

সহজ সুন্দর মুখ ও ভ্রূ-র সুরেখাযুক্ত চোখ [দেখিয়া মনে হয় যেন] ভ্রমর [ভ্রূ] পঙ্কজের [বদনের] মধু পান করিয়া উড়িবার জন্য পক্ষ [চোখের পালক ও পদ্ম] বিস্তার করিয়াছে। আজ সেই ধনীকে যাইতে দেখিলাম, তাহার রূপ মনে লাগিয়া রহিল। কোটি চন্দ্রের সমতুল তাহার বদনমণ্ডল দেখিয়া আঁখি আর তৃপ্ত হইতেছে না। ইহার পর, যেখানে বরনারী গমন করিল, সেইখানেই আমার নয়ন ধাবিত হইল, যেমন আশালুব্ধ ভিক্ষুক কৃপণের পিছনে পিছনে ধায়। সেইখানেই আমার মন রহিয়া গেল, আমি রহিয়া গেলাম সেই কুচরূপ কাঞ্চনগিরির সন্ধিপথে। সেই অপরাধে মনোভব মনকে সেইখানেই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

বিদ্যাপতি-বিষয়ক পদসংগ্রহসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম নেপাল পুথিকেই (Vidyapati Ko Padvali) শুধুমাত্র অবলম্বন করিয়া ডক্টর সুভদ্র ঝা

আলোচ্য পদের যে পাঠ নির্দেশ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ততহি ধাওল দুহু লোচন রে যেহি পথে গেলি বরনারী
আসা-লুবুধল ন তেজয় রে কৃপণক পাছু ভিখারী ॥[১] ধ্রু ॥
সহজহি আনন সুন্দর রে ভৌহ নিবিত আখি।
পঙ্কজ মধুকর মধু পিবি রে উড়এ পসারলি পাখি ॥[২]
আজে দেখলি ধনি যাইতে রে রূপ রহল মন লাগি।
রূপ লাগল মন ধাওল রে কুচকঞ্চন গিরি সান্ধি ॥[৩]
তে অপরাধে মনোভব রে ততএ ধএল জনি বান্ধি ॥[৪]
বিদ্যাপতি কবি গাইহ রে গুণ বুঝ রসিক সুজান ॥[৫]
রাজাহুঁ রূপনরায়ণ রে লখিমা দেবী রমান ॥[৬]

নেপাল পুথির পাঠের সঙ্গে বাংলা দেশের প্রাচীনতম বৈষ্ণব সংকলন-গ্রন্থের পাঠের ভিন্নতা সহজেই লক্ষণীয়। রসিক বৈষ্ণবগণ আপন মনো-ভাবের দ্বারা পদটিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া লইয়াছেন। শ্রীরাধিকার রূপের অপরূপ অভিব্যক্তির আস্বাদের দ্বারা পাঠককে আকর্ষণ করিয়াছেন প্রথমেই। তারপর শ্রীকৃষ্ণের আর্তির সঙ্গে পাঠকের আর্তিকে সংযুক্ত করিবার কামনা করিয়াছেন। নেপাল পুথির পাঠে যখন দেখি—

আজে দেখলি ধনি যাইতে রে রূপ রহল মন লাগি।
রূপ লাগল মন ধাওল রে কুচ কঞ্চন গিরি সান্ধি ॥

কুচরূপ কাঞ্চনগিরির সন্ধিপথে যৌবন রসের কবি বিদ্যাপতি মুগ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব রসিকজন শুধু তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া আপনার রস-কল্পনাকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়াছেন অপরূপ কাব্য-মাধুর্যের অপরিমেয় অভিব্যক্তিতে।

আজু পেখলু ধনী, যাইতে রে, রূপে রহল মন লাই।
কোটি সুধাকর, বদন মণ্ডল, আঁখি তিরপিত নাহি পাই ॥

রূপ হইতে রূপাতীতের জগতে এই উত্তরণ বৈষ্ণব কবিদের সংযোজন মাত্র। ইহা কবি বিদ্যাপতির পদের প্রক্ষিপ্ত অংশমাত্র। বাঙ্গালী বৈষ্ণব

কবি আপনার হৃদয়ের কাব্য-মাধুর্যকে বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া বিদ্যাপতিকে বৃহত্তর জগতের কবিরূপে পরিচিত করাইয়াছেন।

আলোচ্যমান পদে এই একটিমাত্র ছত্রই এ পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করা গেল। কিন্তু এই পদটিতেই আরও কিছু অংশ সম্ভবত পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলীর পাঠ। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

সহজহি আনন সুন্দর ভউহ সুরেখলি আঁখি।
পঙ্কজ মধু পিবি মধুকর উড়এ পসারএ পাখি ॥১
ততহি ধাওল দুহু লোচন রে জতহি গেলি বরনারী।
আশা লুবুধল ন তেজএ রে কৃপণক পাছু ভিখারি ॥২
ইঙ্গিত নয়ন তরঙ্গিত দেখল বাম ভউহ ভেল ভঙ্গ।
তখন ন জানল তেসরে গুপত মনোভব রঙ্গ ॥৩
চন্দনে চরচু পয়োধর গীম গজ মুকুতা হার।
ভসমে ভরল জনি শঙ্কর সির সুরসরি জলধার ॥৪
বাম চরণ অগুসারল দাহিণ তেজইতে লাজ।
তখন মদন সরে পূরল গতি গঞ্জএ গজরাজ ॥৫
আজ যাইতে পথে দেখলি রে রূপে রহল মন লাগি।
তেহি খণ সঞো গুণগৌরব রে ধৈরজ গেল ভাগি ॥৬
রূপ লাগি মন ধাওল রে কুচকাঞ্চন গিরি সাঁধি।
তেঁ অপরাধে মনোভব রে ততহি ধএল জনি বাঁধি ॥৭
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে রস বুঝ রসমন্তা।
রূপনরায়ণ নাগর রে লখিমা দেবী সুকন্তা ॥৮

নিম্নরেখ ছত্রগুলি নেপাল পুথি এবং ক্ষণদার অতিরিক্ত। ক্ষণদায় যে প্রক্ষিপ্ত ছত্রটি [কোটি সুধাকর, বদন-মণ্ডল, আঁখি তিরপিত নাহি পাই] পাওয়া গিয়াছিল, এখানে সেটি নাই। স্বভাবতঃই এই পদের 'অতিরিক্ত' রচনা পূর্ববর্তী কবির নয়। অন্য কোন কবির রচনা এই ছত্র কয়টি। মৈথিল বিদ্যাপতির পদের সহিত যিনি এই ছত্র কয়টি সংযুক্ত করিয়াছেন,

তিনি যে সতর্ক-নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃত্রিম ব্রজবুলিতে যেটুকু তিনি রচনা করিয়াছেন, সেটুকু মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ব্যতীত অপর কাহারো রচনা এ-কথা বুঝা দুঃসাধ্য। মৈথিল কবির সম্ভোগ-রসের প্রাবল্য এবং শঙ্কর-ভক্তির কথা অবিদিত নাই। তাই সম্ভোগ-রসের পথে 'শঙ্কর'কে বাঁধিতে চাওয়া মৈথিল কবির পক্ষে অসম্ভব কল্পনা নয়। বিশেষত, নেপাল পুথির পদেও যখন এরূপ পাওয়া যায়—

হেরি পয়োধর মনসিজ আধি।
সম্ভু অধোগতি ধএ সমাধি॥
বিপরীত রমন রসএ বরনারী।
রতি রস লালসে মুগধ মুরারী॥ (মিত্র-মজুমদার ৪৯৫ পদ)

নেপাল পুথির পাঠকে প্রাচীনতম বলিতেই হয় অন্যদিকে ক্ষণদার পাঠ বাংলা দেশের প্রাচীনতম পাঠ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে নগেন্দ্র গুপ্তের পাঠের এই অতিরিক্ত-অংশকে অপব কবিব রচনা না বলিয়া উপায় নাই। ভণিতার দিকটিও এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য। পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, ক্ষণদায় ভণিতা নাই, শুধু 'বিদ্যাপতিব পদ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নেপাল পুথির ভণিতা,—

বিদ্যাপতি কবি গাইহ রে গুণ বুঝ রসিক সুজান।
রাজাহুঁ রূপনারায়ন রে লখিমা দেবী রমান॥

এই অংশের সঙ্গে নগেন্দ্র গুপ্তেব পাঠান্তর বেশ স্পষ্ট।

বিদ্যাপতি কবি গাওল রে রস বুঝ রসমন্তা।
রূপনরায়ণ নাগর রে লখিমা দেবী সুকন্তা॥

নগেন্দ্র গুপ্তের সংস্করণে গৃহীত ভণিতা সম্পর্কে বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভূমিকায় সম্পাদক শশিনাথ ঝা এবং দীনেশ্বর লাল আনন্দ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন [পৃঃ ৩৫],—

"গুপ্ত মহোদয় নে 'নেপাল-পদাবলী' কে কই পদোঁ মেঁ জিনকে নীচেঁ মূল প্রতি মেঁ কেবল 'ভনহ বিদ্যাপতিত্যাদি' বা 'ভনে বিদ্যাপতিত্যাদি'

লিখা হুয়া হ্যায়, নিজ-নির্মিত ভণিতা জোড় দী হ্যায়। উদাহরণার্থ, 'নেপাল-পদাবলী'কে ৩৫ সংখ্যক পদকে নীচে কেবল 'বিদ্যাপতিত্যাদি' লিখা হুয়া হ্যায়; কিন্তু গুপ্ত মহোদয় নে অপনে সংস্করণকে ৬৯৩ সংখ্যক অসী পদকে নীচে নিম্নলিখিত ভণিতা লগা দী হ্যায়—

ভনহ বিদ্যাপতি গাওল রে
রস বুঝএ রসমন্তা।
রূপনরায়ণ নাগর রে
লখিমা দেখি সুকন্তা॥

নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় 'নিজ-নির্মিত ভণিতা জোড়' দিয়া পদ সমাপ্ত করেন নাই বলিয়াই আমার ধারণা। যে পদটির উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে, তাহা "মেহে পরদেস পর জোসি ও রসিয়া" [মিত্র-মজুমদার ৫০৪]। সেই পদের পাঠান্তরেও কিছু নূতনত্বের স্পর্শ আছে। আলোচ্য পদের অতিরিক্ত অংশ যাঁহার রচনা, তাঁহারই রচনা এই ভণিতা। এইরূপ ভণিতা হয়ত কোন একজন কবি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। যাহা হউক, গুপ্ত মহাশয়ের ইহা নিতান্তই নিজস্ব সৃষ্টি এরূপ অনুমান অযৌক্তিক।

মৈথিল বিদ্যাপতির এই পদটি বর্তমানে প্রাচীন পাঠের দ্বিগুণিত হইয়াছে। অতিরিক্ত অংশের রচয়িতা যে একজন কবি, তাহা নয়। নানা কবির হস্তাবলেপ পড়িয়াছে বিদগ্ধ কবির রচনায়। ইহার পর আছে, মহাকালের নিরন্তর গতিধারা, যাহার অমোঘ স্পর্শে পুরাতন আর পুরাতন থাকে না, নূতনের বেশে সে আসিয়া মুগ্ধ করিতে চায়। প্রাচীন শব্দের ব্যবহার নূতনের বেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চায়। বিদ্যাপতির পদের মধ্যেও এই পরিচয় সহজেই উদ্ঘাটিত করা যায়।

১ 'যেহি পথে গেলি বরনারী'=যঁহি যঁহি গেলি বরনারী

[সাধারণ পাঠক 'যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরঈ' ভুলিতে পারে না। তাহারই সুর পরবর্তী কালের কবি বোধ করি এখানে পরোক্ষে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।]

২ ভীহ নিবিত আখি=ভাঙ সুরেখনি আঁখি

৩ আজে দেখলি ধনি=আজু পেখলুঁ ধনী

ভাষাগত রূপান্তরের চিহ্ন ইহার প্রায় সর্বত্র। মৈথিল কবিকে বাংলা দেশ নূতন কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। সেইজন্যই বর্তমানে মৈথিল কবির রচনার যথার্থ রূপ উদ্‌ঘাটন করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদ্যাপতির ভণিতায় বহু বাঙ্গালী কবির কবিধর্ম জড়ানো। সেই কবি-সমাজ কালের সোনার তরীতে ফসল তুলিয়া কখন নিঃশব্দে বিদায় লইয়াছেন, তাহা বুঝাই দুষ্কর।

দুই

বিদ্যাপতি-পদাবলীর রূপান্তর সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পদসমূহের রূপান্তর হইয়াছে কি না, তাহা দেখা প্রয়োজন। বিদ্যাপতি-পদাবলীর প্রাচীন সংগ্রহ বলিতে আমরা গ্রীয়ার্সন-সংগ্রহ এবং নেপাল ও রামভদ্রপুরের পুথির পাঠকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। কিন্তু পদগুলির বিচারের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতে হয় যে, গ্রীয়ার্সন-সংগ্রহের ভাষার সহিত নেপাল পুথির বা রাম-ভদ্রপুরের পুথির ভাষার পার্থক্য খুবই বেশী। কোনটির সঙ্গে কোনটির পুরাপুরি মিল নাই। এই প্রাচীন সংগ্রহসমূহের সহিত বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদাবলীর পাঠান্তর যখন আমরা বিচার করি, তখনও পার্থক্যটা খুব বড় ভাবে দেখা দেয় এবং তখনই বাংলা দেশের পদগুলির গুরুত্ব আমরা অনেকখানি লঘু করিয়া দেখি। গ্রীয়ার্সন-সংগ্রহের সহিত নেপালের বা নেপালের সহিত রামভদ্রপুরের পাঠান্তর যত বেশীই হউক না কেন, তাহাকে আমরা তত বেশী গুরুত্ব দিই না। অথচ, সেই একই ধারা যখন বাংলা দেশের পদমধ্যে ধরা পড়ে, তখন সেগুলিকে একেবারে অপাংক্তেয় মনে করিতে অনেকেই দ্বিধা করেন না। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও যে একেবারে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহা সর্বক্ষেত্রে বলা চলে না। তবে ভাষা ভাবকে কখনো বা নবতর মহিমায় প্রতিষ্ঠা দান করে,

আবার কখনো বা প্রচলিত ভাবেরই বাহকরূপে দেখা দেয়। নিম্নে গ্রীয়ার্সন-সংগৃহীত একটি পদ এবং নেপাল পুথিতে তাহার রূপান্তর কিভাবে দেখা গিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া গেল।

ননদী সরুপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার বেভিচার বুঝৈবহ
সাসু করয়বহ রোসে॥
কৌতুক কমল নাল হম তোডলি
করয় চাহলি অবতংসে।
রোস কোস সয় মধুকর ধাওল
তেঁহি অধর কর দংসে॥
সরবর-ঘাট বাট কণ্টক-তরু
হেরি নহি সকলহুঁ আগ্
সাঁকরি বাট সাঁকর চললহু
তে কুচ কণ্টক লাগ্॥
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহিঁ থাকএ
তেঁ উধসল কেশ পাশ।
সখিজন সঁয় হম পাছে পডলিহু
তেঁ ভেল দীঘ নিসাস॥
পথ অপরাধ পিসুন পরচারল
তথিহু উতর হম দেলা।
অমরথ তাহি ধৈরজ নহি রহলে
তেঁ গদ গদ সর ভেলা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
ঈ সভ রাখহ গোঈ।
ননদী সয়ঁ রস-রীতি বঢাওব
গুপুত বেকত নহি হোঈ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পদটি উপরে উদ্ধৃত হইল। এই পদেরই নেপাল পুথির পাঠ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। দুইটি পাঠ মিলাইলে মনে হয়, যেন এক স্বতন্ত্র পদের সহিত পরিচিত হইতেছি।

সরোবর যাই বিকট সঙ্কট
তহ হেরহি ন পারলে আগু।
সাঙ্কলি বাট উবটি চলি ভেলিহু
তে কুচ কণ্টক লাগু ॥ ধ্রু ॥
ননন্দহে সরূপ নিরুপিঅ রোস।
বিনু বিচারে বিহুচার বুঝওলহ
সাসু করওলহ রোস ॥
কৌতুকে কমল নালসঞো তোলল
করএ চাহল অবতংস
রোষে কোষসঞো মধুকর ধাওল।
তেহি অধর করু দংস ॥
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহি থাকএ
উধসল কেসপাস।
আতপ দোসে রোষে চলি অইলিহু
খরতর ভেল নিসাস ॥
বেকত বিলাস কএোনে তব ছাপব
বিদ্যাপতি কবি ভান।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমাণ ॥

গ্রীয়ার্সনের পদের অষ্টম হইতে একাদশ ছত্র নেপাল-পাঠের প্রথমাংশ। ভাষার পার্থক্য স্পষ্ট। ভণিতার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রীয়ার্সন এবং নেপাল-পাঠের ভিন্নতা এতই বেশী যে, সেক্ষেত্রে বাংলা দেশে প্রাপ্ত এই পদের রূপান্তর আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বাংলা দেশে এই পদটির কোন গুরুতর পরিবর্তন হয় নাই। সয়ঁ = সঞো, ঈ সভ = ই সভে, গোঈ = গোই, হোঈ হোই, বঢ়াবহ = বঢ়াওব প্রভৃতি পরিবর্তন খুব উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রীয়ার্সনের এবং নেপালের পুথির পাঠান্তরে যে দুস্তর ভেদ দেখা গেল, এরূপ পার্থক্য অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। নেপাল পুথির সঙ্গে রামভদ্রপুরের পুথির পাঠের পার্থক্য এবং সেগুলির সহিত বাংলা দেশের পাঠান্তর কিরূপ, তাহা পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদটির আলোচনায় দেখা যাইবে।

সে অতি নাগর তঞ সব সার।
পসরয়ো মল্লী পেম পসার॥
জৌবন-নগরি বেসাহব রূপ।
ত তে মুল ইহহ জতে সরূপ॥
সাজনি রে হরি রস-যনিজার।
গোপ-ভরমে জনু বোলহ গমার॥
বিধি বসে অধিক করহ জন মান।
সোরহ-সহস গোপীপতি কাহ্নু॥
তোহি-হুনি উচিত রহত নহি ভেদ।
মনমথ মধথে করব পরিচ্ছেদ॥ (নেপাল ১১০)

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, পদটিতে পূর্ণ ভণিতা নাই। তবে "ভণই বিদ্যাপতিত্যাদি" উল্লেখ আছে। রামভদ্রপুরের পুথিতে পাঠভেদের সঙ্গে সঙ্গে ভণিতার পূর্ণ রূপটিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সে অতি নাগর তঞ রসসার।
পসরয়ো বীথি পেম পসার॥
জৌবন নগর বেহাসত রূপ।
ততে মুল ইহহ জতে সরূপ॥
সাজনি সে হরি রস-যনিজার।
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার॥
বিধিবসে আবে করব নহি নাম।
জইঅও বোলহ সহসপতি কাহ্নু॥
তহি তোঁহ উচিত বহু সে ভেল।
মনমথ মধথে করব পরিচ্ছেদ॥
ভণই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেবি রমান॥

নিম্নরেখ ছত্রসমূহে নেপাল পুথির পাঠের সঙ্গে রামভদ্রপুরের পাঠের যে কিরূপ প্রভেদ, তাহা সহজেই ধরা যায়। পরপৃষ্ঠায় বাংলা দেশে প্রাপ্ত এই পদটির রূপান্তর দেওয়া গেল।

সে অতি নাগর তঞে সব সার।
পসর ও মল্লিকা পেম পসার ॥

ইহার পর সমগ্র পদটি নেপাল পুথির অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম শ্লোকে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী কবিচিত্তের সরসতার স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তঞে' এবং 'মল্লিকা' এই দুইটি শব্দ দ্বারাই বাংলা দেশের রসিক সমাজ পদটিতে অধিকতর মাধুর্য সংযোজিত করিয়াছেন। নাগরীকে 'মল্লী' বলিয়া আপন হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য যেন উজাড় করিয়া দিতে পারে না। সেই কারণে, 'মল্লিকা, তোমার প্রেম পসরা প্রসারিত কর' বলিয়া কবি নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছেন। এইভাবেই বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর রূপান্তর ঘটিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী যেন 'দুধক পানী',—তাহাকে যখন যে পাত্রেই রাখা যাউক না কেন, তাহা সকল সময়েই অমৃত পরিবেশন করিবে। সর্বপাত্রেই তাহার সমান অবস্থান। তথাপি কোথাও তাহার মাধুর্যের এবং গৌরবের হানি হয় না। আলোচ্য পদটিতে নেপাল এবং রামভদ্রপুরের পাঠের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। কিন্তু এই পার্থক্য যদি বাংলা দেশের পদের সহিত তুলনা করা যায়, তবে তাহা গুরুতর অপরাধ হিসাবে গৃহীত হয়। অথচ, বিদ্যাপতির প্রাচীন পদ-সংকলন-গ্রন্থসমূহের পারস্পরিক বিভেদ যে কতখানি, তাহা যথার্থ বিশ্লেষণ না করিলে বুঝা যায় না।

তিন

বিদ্যাপতির পদাবলীর রূপান্তর ঘটিয়াছে নানাভাবে। মূলত, ভাষা এবং ভাবের ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরের প্রাধান্য সর্বাধিক। বিদ্যাপতির কোন একটি পদকে কেন্দ্র করিয়াই অনেকগুলি পদ রচিত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই জাতীয় রূপান্তরের যথার্থ পরিচয় নিম্নের আলোচনায় কিছুটা প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি-বিষয়ক একটি পদ গ্রীয়ার্সন-সংগ্রহ হইতে পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। এই পদটিকে কেন্দ্র করিয়া নানাভাবে বাংলা দেশের কবিগণ গুঞ্জরণ করিয়াছেন।

ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।
চরণ-চপলতা লোচন লেল॥
দুহুক নয়ন কর দূতক কাজ।
ভূসন ভএ পরিণত ভেল লাজ॥
আব অনুখন দেঅ আঁচর হাথ।
কাজ সখী সয়ঁ নত কএ মাথ॥
হম অবধারলি সুন সুন কাহ্নু।
নাগর করথু অপন অবধান॥
ভউহ ধনু গুণ কাজর-রেখ।
মার নয়ন সর পুংখ অবশেখ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি গাব।
রাজা সিবসিংঘ বুঝ রস ভাব॥ (গ্রীয়ার্সন ২৪)

এই পদটিকে অনুসরণ করিয়া বাংলা দেশে বিদ্যাপতি ভণিতায় যে কয়টি পদ পাওয়া যায়, সেগুলির পরিচয় এবং সেই পদগুলির মধ্যে বাঙ্গালী কবিচিত্তের প্রকাশ কিভাবে ঘটিয়াছে, তাহার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইবে। নিম্নে পাঁচটি পদের প্রথম চরণ উদ্ধৃত হইল।

(ক) শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥ ক্ষণদা ৫, প. ত. ১০৪, কী ২৩০, ন. গু. ৪, কা ৪, হ. ৩

(খ) শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল॥ প. ত. ৮২, কী ২৩২, ন. গু. ৩, হ. ১, কা ৪

(গ) শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥ প. ত ১০৬, ন. গু. ৫, রা ৪, হ ২

(ঘ) দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥ ন. গু. ৭, বরাহ ২২

(ঙ) পহিল বদরি কুচ পুন নরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢয় পীড়য় অনঙ্গ॥ ন. গু. ৮, হ. ৫, কী ২৩১

উপর্যুক্ত পাঁচটি পদই নেপাল, রামভদ্রপুর এবং লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে নাই। সব কয়টি পদই বাংলা দেশে প্রাপ্ত। এই পদ কয়টির সঙ্গে

বিদ্যাপতির পূর্বোদ্ধৃত পদটির ভাবগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যাপতির পদটিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালী কবিচিত্ত নানাভাবে গুঞ্জন করিয়াছে। বিদ্যাপতির কাব্য-জগতের অপরূপ মাধুর্যে কবিগণ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কবিচিত্ত নানাভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, যেন শুধুমাত্র বিদ্যাপতি-আস্বাদন কামনার জন্যই। উপরি-উল্লিখিত পদসমূহের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইবে। প্রাচীনতম সংকলন-গ্রন্থ [বাংলা দেশের] ক্ষণদায় 'ক' পদটি আছে [৫ সংখ্যক—মিত্র-মজুমদার সংস্করণ]। এই পদটির সঙ্গে গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত পূর্বোদ্ধৃত পদটির সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, ক্ষণদার এই পদটির ভাবমাধুর্য এবং ভাষাগত ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হইয়া অপর যে পদগুলি রচিত হইয়াছে, তাহারও পারস্পরিক আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নে, ক্ষণদার পদটি উদ্ধৃত হইল।

তিরোধা ধানশী

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দোঁহু দল-বলে ধনী, দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্দয়ে কুচ কবহুঁ বিথার।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘার॥
থির নয়ন অথির কছু ভেলা।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেলা॥
ক [শশিমুখী ছোড়ল শৈশব দেহে।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহে॥
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ॥]
চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ॥

ক্ষণদার এই পাঠের সঙ্গে বরাহনগর ২২-সংখ্যক পুথির পাঠ এবং কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮১-সংখ্যক পুথির পাঠের ঐক্য দেখা যায়। কিন্তু 'ক' অংশ পদামৃতসমুদ্র, কীর্তনানন্দ, নগেন্দ্র গুপ্তের সংস্করণে এবং মিত্র-মজুমদারের সংস্করণে নাই। পদকল্পতরুতে 'ক' অংশ প-র-সা পুথির অতিরিক্ত পাঠ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অতিরিক্ত অংশে প্রথম চরণের পরেই আরও দুইটি যে অতিরিক্ত চরণ রহিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

অবগাহ সদন বাঢ়ায়ল দিঠ।
সো সব সকলি চমকি দিল গীঠ॥
দিনে দিনে উপজল পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥

এই পদটির ইহা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর [প. ত., কী., ন. গু., হ.] শেষের দুই ছত্রে,—

বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
ধৈরয ধরহ মিলায়ব আন॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ধৃত পাঠের মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে, ইহাতে কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আকারে বা ইঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় নাই। যে-কোন কিশোরীর বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব রসিকেরা এরূপ সাধারণ রূপ বর্ণনাকে সমাদর করিতে পারেন না। যাহাতে রাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলার কিছুমাত্র সংযোগ নাই, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করা অপরাধ-জনক মনে করেন। তাই দেখি, ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌরসুন্দর দাস ও তাঁহার পরে বৈষ্ণবদাসের সংকলনে কৃষ্ণলীলাদ্যোতক এই চরণ দুইটি সংযুক্ত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
ধৈরয ধরহ মিলায়ব আন॥

এখানে শুধু যে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা নয়, বিদ্যাপতিকে একেবারে মঞ্জরী-ভাবাপন্ন সাধক করিয়া তোলা হইয়াছে। মঞ্জরীদের কার্যই হইতেছে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণের মিলন-সাধনের প্রচেষ্টা। বিদ্যাপতি

বলিতেছেন যে, রাধে তুমি ধৈর্য ধর, আমি কৃষ্ণকে আনিয়া [আন] তোমার সহিত মিলিত করাইব। এই সংকেতটিকে চাবিকাঠিরূপে ব্যবহার করিয়া আমরা বিদ্যাপতিকে কিভাবে বাংলার বৈষ্ণবেরা একেবারে বৈষ্ণব ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহা দেখাইব।

শৈশব এবং যৌবন—এই উভয়ের সাক্ষাৎকালে শ্রীরাধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হইয়াছেন। তিনি কাহার আনুকূল্য করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দ্বন্দ্ব-মাধুর্যের ভাবে স্ফুরিতাধরা শ্রীরাধিকার কৈশোর-সৌন্দর্যকে নবকবিশেখর বিকশিত করিয়াছেন—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদন-কিতাব পহিল পবচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহ্নিকে খীন উন্‌কে অবলম্ব॥
প্রকট হাস;অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্নকে লেল॥
চরণ চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥
নব কবি শেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার॥

এই পদটি পদকল্পতরুতে (১০৬) নবকবিশেখর ভণিতাযুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী'-তে [১৯৫৫] পদটি গৃহীত হইয়াছে। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে [১৩৬৭] এই পদটি 'বাঙ্গালী-বিদ্যাপতি'-র বলিয়া বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'নব কবিশেখর'-কে যদি 'শেখর', 'কবি-শেখর', 'শেখর-রায়', 'রায়-শেখর'-এর সঙ্গে অভিন্ন ধরা যায়, তবে এই পদটি নবকবিশেখরের অর্থাৎ অ-বিদ্যাপতির। বাঙ্গালী কবি কবিশেখরকে নবকবিশেখরের সঙ্গে যেমন অভিন্ন কল্পনা করা যায় না,

তেমনি কবিশেখরের সঙ্গে ভিন্নতা প্রদর্শনের জন্য কোন বাঙ্গালী পদকর্তাকে নবকবিশেখররূপে আখ্যাত না করারও কোন কারণ নাই। পদকল্পতরুতে নবকবিশেখর ভণিতায় ৪টি পদ আছে। নগেন্দ্র গুপ্ত '(যব) ঋতুপতি নব পরবশে' পদটি ব্যতীত অপর ৩টি পদকেই বিদ্যাপতির বলিয়া ধরিয়াছেন। সম্ভবত অপ্রণিধান-প্রযুক্ত হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে; কারণ, শেষোক্ত পদটিকে বাতিল করার কোন যুক্তিও তিনি দেখান নাই। এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় 'বিদ্যাপতি বিচার' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখানে 'নব কবিশেখর' সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি বাঙ্গালী কবি নহেন; বিদ্যাপতির রচনার সহিত সৌসাদৃশ্য দর্শনে এই পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।" পূর্বেই দেখাইয়াছি, গ্রীয়ার্সনের সংগৃহীত পদ অবলম্বনে এই পদগুলি রচিত। নেপাল, রামভদ্রপুর এবং গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহভুক্ত নয় এগুলি। পদগুলি নিতান্তই বাংলা দেশের এবং বিদ্যাপতি-অবলম্বনে রচিত। তাই এই স্বাভাবিক 'সৌসাদৃশ্য'।

তাহা ছাড়া 'কিতাব' শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া সন্দেহ দৃঢ়তর হয়। [ক] পদের অর্থ-বিশ্লেষণ করিলে সঙ্গতিরক্ষার্থে আলোচ্য পদটিকে পূর্বে স্থাপন করা চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮১-সংখ্যক পুথিতে প্রথমে আলোচ্য পদটি ও পরে 'ক' পদটি স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে শ্রীরাধিকার দেহে মদনের অধিকার-বিস্তার এবং পরে শ্রীরাধিকার মনোদ্বন্দ্ব।

শ্রীরাধিকা বারবার আপনাকে নিরীক্ষণ করেন। তাঁহার সমগ্র দেহ-ভঙ্গিমা এবং আচার-আচরণ আর নিতান্ত বালিকার মতো নাই। বালিকা শ্রীরাধিকা এখন কিশোরী রাইরূপে চিত্রিতা। পদকল্পতরুর ৮২-সংখ্যক পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তিরোধা

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥

মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরয়ে অঙ্গ॥
মাধব পেখলুঁ অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
দুহুঁ এক যোগ ইহকে কহে সেয়ানি॥

এই পদটির পাঠান্তর প্রসঙ্গে পদকল্পতরুর সংকলক লিখিয়াছেন, 'পহিল' ইত্যাদি পংক্তি হইতে বাকী পংক্তিগুলি পদরসসার-পুথিতে [৭।৭] নূতন পদ গণ্য করা হইয়াছে এবং উহাতে নিম্নলিখিত পাঠান্তর ও অতিরিক্ত কলি দৃষ্ট হয়। যথা—

পহিলে বদরি কুচ পুন আন রঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়ল পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো অব ভৈ গেল বিজক পূর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখলুঁ রমণি সন্ধান।
ঘাটহি ভেটল করত সিনান॥
তনু সুখ বসন তনু হিয়ে লাগি।
যো পুরুখ দেখব তাকর ভাগি॥
উরহি লোলত চাঁচর কেশ।
জনু, চামরে ঝাপন কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥

পদকল্পতরুর এই অতিরিক্ত পাঠান্তরটি স্বতন্ত্র পদরূপে নগেন্দ্র গুপ্তের ৮-সংখ্যক, কীর্তনানন্দের ২৩৩-সংখ্যক, মিত্র-মজুমদারের ৬১৭-সংখ্যক এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলনে ৫-সংখ্যক পদরূপে গৃহীত হইয়াছে।

একই পদের দুইবার ভণিতা হয় না। সেক্ষেত্রে দুইটি স্বতন্ত্র পদ হিসাবে গ্রহণে বাধা নাই সত্য, কিন্তু মূল পদবন্ধের সহিত ভাষাগত এবং ভাবগত আশ্চর্য মিল অস্বীকার করা যায় না। মূল পদটির প্রথম পংক্তির প্রায় পুনরুচ্চারণ দেখা যায় দ্বাদশ পংক্তিতে। এ ছাড়া, নিম্নোদ্ধৃত পদটির সঙ্গে সাদৃশ্য-সন্ধান করিলে একই ভাষার, একই ভাবের, এমন কি একই পংক্তির বারংবার প্রয়োগ শিল্পী কবি বিদ্যাপতির প্রতিভাকে ম্লান করিয়া দেয়। কোন কবি বারবার একই কথা একই ভাবে এবং ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন, ইহা কষ্ট কল্পনার নামান্তর। সম্ভবত সেইজন্যই পদটি মিত্র-মজুমদার সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে রস অত্যন্ত তরল। ভাবের গভীরতা নাই-ই, এমন কি সঙ্গতিরও অভাব। মুগ্ধা নায়িকা কখনই স্পষ্টরূপে সুরতব্যাপার সম্পর্কে কৌতূহল দেখায় না।

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।[১]
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥[১ক]
আবে[২] মদন বঢ়াওল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দেল[৩] পীঠ॥
শৈশব ছোড়ব বাশিমুখি দেহ।[৪]
খত দেহ তেজল ত্রিবলি তিন রেহ॥
অব[৫] ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।
দম্পতি পরাভবে[৬] সৈনক ভঙ্গ॥[৭]
তকর আগে তোহর পরসঙ্গ।
বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয়।
রাধারতন জিসে তুয় হোয়॥

পাঠান্তর: ১ কা দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন (বরাহ ২২) দিনে দিনে উন্নল পয়োধর পীন ; ১ ক কা—ইহার পর বরাহ ২২ পুঁথিতে পরবর্তী পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তি এবং পরে এই তৃতীয় ২ কা অবহি। (বরাহ ২২—অবগাহ) ; ৩ কা দিল ;

(বরাহ ২২); ৪ বরাহ ২২—শশিমুখী তেজলি শৈশব দেহ; কা—এই পংক্তি হইতে পূর্বোদ্ধৃত 'পহিল বদরী কুচ পুন নববঙ্গ' পদটি সম্পূর্ণ রহিয়াছে। ৫ বরাহ ২৮ এবে; ৬ বরাহ ২২ পরাভব; ৭ বরাহ ২২—ইহার পর শেষের চারি ছত্র নাই। এমন কি ভণিতা অংশও নাই।

আলোচ্য পদটিতে ক এবং খ পদের ছত্রসমূহ কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সহজেই লক্ষণীয়। বিদ্যাপতির পদের কয়েকটি ছত্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া অপর কবিগণ তাঁহাদের রচনার সঙ্গে বিদ্যাপতির ছত্র যুক্ত করিয়া, সমগ্র পদটি বিদ্যাপতির নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বোদ্ধৃত পদটির মতই আর একটি পদ [কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণ হইতে] নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, এই পদটিও মিত্র-মজুমদার সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আওপ যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

পূর্বের আলোচিত পদসমূহ হইতে এই পদের ভাব, ভাষা, এমন কি সম্পূর্ণ ছত্রও এই পদে ব্যবহার করা হইয়াছে। আর পদের নিঃসংশয়তা প্রমাণ করিবার জন্য রাজা শিবসিংহ এবং লছিমার নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই পদটি কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের সংস্করণ ব্যতীত অপর কোন সংকলন-গ্রন্থে [নগেন্দ্র গুপ্তের

সংকলনেও] নাই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কোন পদেরই আকর উল্লেখ করেন নাই। আলোচ্য পদটি যে বিদ্যাপতির তাহা একালের সংকলকগণের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াও বলা যায় না। বিদ্যাপতির পদ ভাঙ্গিয়া কিভাবে নূতন পদ রচিত হইয়া বিদ্যাপতির নামেই তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এই পদটি তাহারই অন্যতম নিদর্শন। গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত পদটির সহিত ভাবগত সাদৃশ্য এই পদের আছে। গ্রীয়ার্সনের পদটিই যেন বাংলার বাঙ্গালীর রসচেতনার উপযোগী করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। মৈথিল বিদ্যাপতির পদই যে রূপান্তরিত অবস্থায় এই পর্যায়ে আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে পদগুলি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল পদই মৈথিল কবির ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিয়া বাংলা রূপ লইয়াছে। এই পর্যায়ের ঐ পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদের বাংলা রূপান্তর না বলিয়া উপায় নাই।

বিদ্যাপতির মৈথিল পদের বাংলা রূপান্তর নানাভাবে ঘটিয়াছে। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে বিদ্যাপতির প্রামাণিক পদ পর্যায়ের ধৃত নিম্নের পদটি [৬১৮] কিভাবে রূপান্তরিত হইযাছে, তাহা দেখানো হইল।

কিএ মঝু দিঠি পডলি সসিবয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুহু নয়না॥
দারুণ বঙ্ক-বিলোকন থোর।
কাল হোয় কিএ উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল অছ সুনইত রাব।
চলইত চাহি চরণ নহি জাব॥
আসা-পাস ন তেজই সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ॥ (প. ত. ১৯৪ ; মি.-ম. ৬১৮)

এই পদটিই গীতচন্দ্রোদয়ে দুইবার দুইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম উল্লেখে পদটি কিছু কিছু শব্দ পরিবর্তন করিয়া বেশ বদল করিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাবও ভালভাবেই পরিবর্তিত হইয়াছে।

কিএ মঝু দিঠ শশি বয়না।
নিমেষ নিবারি রহল দো নয়না।
দারুণ বঙ্ক বিলোকন ঘোর।
কাল হোই হিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল অছু শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥
আশা-পাশ না তেজই সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম তরঙ্গ॥ (পৃঃ ২১)

নিম্নরেখ শব্দগুলি পদকল্পতরুর পাঠের সহিত পার্থক্য সূচিত করিয়াছে। নিমিষ=নিমেষে, নহি=নাহি-তে, ন=না-তে বাংলা শব্দের শিথিল উচ্চারণের বশবর্তী হইয়া পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবে শব্দগত এই ঈষৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই ভাবের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। 'হোয় কিএ'-র স্থলে 'হোই হিয়ে'-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথম পদে কবির বর্ণনায় দেখি— নাগর ভাবিতেছেন যে, এই বক্র দৃষ্টিই কি আমার কাল হইল ; আর দ্বিতীয় পদে ঐ সামান্য শব্দ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কবি বলেন, ঐ দৃষ্টিই কাল হইয়া আমার হিয়ায় রহিয়া গেল। বিদ্যাপতি ইঙ্গিতে তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় পদে ইঙ্গিত ব্যাখ্যায় পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির কবিধর্ম এখানে স্বভাবতঃই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থে এই পদটির আরও একটি রূপান্তর দেওয়া আছে।

কি যে দেখায়লি পটে শশিবয়না।
নিমিথ নেহারি হরল দো নয়না॥
মানস রহল পয়োধরে লাগি।
অন্তরে রহলহি মনমথ জাগি॥
শ্রবণ রহল দো না শুনলু রাব।
ও রূপ চাও তহি বচন না আব॥

করে কর পরসিতে বিহি করে বাম।
তোহি চরণ ধরোঁ পুরু মঝু কাম॥
নায়রী কয়ল হামারি রসভঙ্গ।
বিদ্যাপতি ভণ নাহি তেজু সঙ্গ

এই পদটি প্রায় নূতন পদে পর্যবসিত হইয়াছে। এমন কি শশি-বয়নাকে দৃষ্টিতে না দেখিয়া পটে নিরীক্ষণ করা হইয়াছে। 'মনোভব' পুরাপুরি 'মনমথে' আসিয়াছে। করে কর স্পর্শ করিবার বাসনাও আর অব্যক্ত থাকে নাই; এখানে আর 'আশা-পাশ না তেজই সঙ্গ' নয়, নায়রীই সকল রস ভঙ্গ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ভাব এবং ভাষা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া যেন সম্পূর্ণ এক নূতন পদে পরিণতিলাভ করিয়াছে। মৈথিল কবি পুরাপুরি বেশ বদল করিয়া একেবারে বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর পরিয়া যেন উপস্থিত হইয়াছেন। নিম্নে গীত চন্দ্রোদয়ের ধৃত মৈথিল বিদ্যাপতির অন্য একটি পদ কিভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা দেখানো যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বপ্ন বিষয়ে স্বগতোক্তি করিতেছেন

পেখলুঁ কামিনী কবয়ে শৃঙ্গার।
সপন হেরি মন হরল হামার॥ ধ্রু॥
নয়নহি অঞ্জন বয়ন উজোর।
কমলিনী কোরে জনু খঞ্জন কোর॥
মধুর অধরে মিলি দশনক জোতি।
মানিকে বৈধল জনু গজমোতি॥
মৃগমদ চন্দন সিন্দুর বিন্দু।
রবি তেজি রাহু ধরল জনু ইন্দু॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর নাহ।
পায়রি সো ধনী কর উপবাহ॥ (পৃ. ৫৪২)

এই পদটির রূপান্তর মিলিয়াছে বরাহনগরের ২২-সংখ্যক পুথির দশম পদে। দ্বিতীয় ছত্রের 'হরল' = 'রহলে'-তে, 'রবি তেজি' = 'রবিভোজ'-এ পরিবর্তিত হইয়াছে। শব্দগত এই পরিবর্তন ছাড়া এই পদটির সঙ্গে আরও

আটটি ছত্র সংযোজিত হইয়াছে। এই সংযোজন ঘটিয়াছে শেষ দুই ছত্রের পূর্বে। নিম্নে এই নূতন অংশ উদ্ধৃত হইল।

মোহে হেরি কমল সাঙরি সখি কোর।
মন তন জীবন চোরায়লি মোর॥
খঞ্জন লোচন ভাঙু কামান।
খন বন মঝু মন হরল যেয়ান॥
কনক মুকুর সম তা কর বয়না।
কামিনী রসময় চঞ্চল নয়না॥
করিচর গমন চলন অতি মন্দা।
কনক অভাব মুখশশি ধন্দা॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস মহিমা।
রাজা শিবসিংহ জানলহি লছিমা॥

নায়ককে দেখাইয়া দেখাইয়া সখীকে আলিঙ্গন করায়, নায়িকাকে আর মুগ্ধা বলা চলে না। সে প্রগল্‌ভায় পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতির মুল পদটি প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। এমন কি ভণিতাটি পর্যন্ত বেশ বদল করিয়া শিবসিংহ ও লছিমা নামে চিহ্নিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভণিতার এই পরিবর্তন কৃত্রিম পদকে অকৃত্রিমতার ছাপে চিহ্নিত করার জন্যই।

অনুরূপ রূপান্তর যে সকল পদের মধ্যে বিশেষ প্রকট, সেই শ্রেণীর একটি বহুখ্যাত পদের পরিচয় দিতেছি।

এ কানু এ কানু তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই॥
মুখ মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্দুলী উড়ই না পার॥
ভাউকি ভঙ্গিম পুছসি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥
পীন পয়োধর দুবরী গাতা।
মেরু উপজল কনক-লতা॥
ভনহুঁ বিদ্যাপতি দূতীকো বচনে।
বিকশল অনঙ্গ না হয় পহুঁ ধরনে॥ (ক্ষণদা—মজুমদার সং ১৫৭ পদ)

পূর্বোক্ত পদটিই নগেন্দ্র গুপ্তের তালপত্রের পুথিতে যেভাবে ধৃত হইয়াছে [৪৯], তাহা উল্লেখযোগ্য।

পীন পয়োধর দুবরি গতা।
মেরু উপজল কনক লতা॥
এ কাহ্নু এ কাহ্নু তোরি দোহাই।
অতি অপরূপ দেখলি সাই॥
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে।
ফুললি মধুরি কমল সঙ্গে॥
লোচন জুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়এ ন পারে॥
ভউঁহেরি কথা পুছহ জনু।
মদনে জোড়লি কাজর ধনু॥
ভণে বিদ্যাপতি দূতী বানে।
এত সুনি কাহ্নু করু গমনে॥

একই পদ দুই রূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নগেন্দ্র গুপ্তের পদের সপ্তম ও অষ্টম ছত্র ক্ষণদায় নাই। অথচ এই দুই ছত্র খুবই প্রসিদ্ধ। পদটির ভণিতার রূপান্তরও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ক্ষণদায় পদটি দশ ছত্রের, গুপ্তের সংস্করণে দ্বাদশ ছত্রের। বরাহনগরের ২২-সংখ্যক পুথির বিংশতি পদে ইহা ষোড়শ ছত্রের পদে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে বরাহ-নগরের পদটি উদ্ধৃত হইল।

মাধব পেখলুঁ নায়রি গোরী।
কাম্নকরূপ ধনি আনলি বোরি॥
মুখ কমল সম সুন্দর অধর সুরঙ্গ।
উয়ল বাণ্ডকলি কণ্ড লক সঙ্গ॥
নয়নহি যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধুএ মাতল উড়ি নাহি পার॥
শুন শুন কানু তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ পেখলুঁ রাই॥ ধ্রু॥

পীন পয়োধর দুর্বার জনু গাথা।
মেরু উপরে উয়ল কনকের লতা॥
ভাঙু যুগ ভঙ্গিম পুহু তহি জনু।
কাজরে জীবন মদন ধনু॥
নয়নক কাজর ভঙ্গিম ছাঁন্দ।
ফল ধনু তেজিয়া মদন চান্দ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
প্রেমক মুরতি হয়লহি কান॥

পদের নিম্নরেখ চারিটি ছত্রই নূতন সংযোজিত হইয়াছে। বহু শব্দের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটিভাবে পদটি বর্ধিত কলেবরে প্রায় নূতন হইয়া গিয়াছে। ইহা যে বিদ্যাপতির নয়, তাহা বলা চলিবে না। আবার ইহাই যে পুরাপুরি বিদ্যাপতির, তাহা বলিলেও সত্যের অপলাপ হইবে। রূপান্তরের মধ্য দিয়া বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী সমাজ নূতন করিয়া সৃজন করিয়া তাহাদের মনোমন্দিরে নিত্যকালের অর্ঘ্য সাজাইয়াছে।

গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থে সংগৃহীত পদসমূহের রূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাপতির পদসমূহ মৈথিল হইতে ভাঙ্গিয়া বাংলায় যেন নব রূপ লইয়াছে। নিম্নে নগেন্দ্র গুপ্তের তালপত্র হইতে সংগৃহীত একটি পদের পরিচয় দেওয়া গেল। এই পদটি প্রায় একই রূপে বরাহনগর ২২-সংখ্যক পুথির ষষ্ঠ পদে পাইতেছি।

সাজনি অকথা কহি না জাএ।
অবল অরুণ সসিক মণ্ডল
ভিতর রহ লুকাএ॥
কদলী উপর কেসরি দেখল
কেসরি মেরু চটলা।
তাহি উপর নিশাকর দেখল
কির তা উপর বইসলা॥
কীর উপর কুরঙ্গিনী দেখল
চকিত ভমএ জনী।

কীর কুরঙ্গিনী উপর দেখল
ভময় উপর ফণী ॥
এক অসম্ভব আওর দেখল
জলবিনা অরবিন্দা।
বেরি সরোরুহ উপর দেখল
জইসন দুতিঅ চন্দা ॥
ভণ বিদ্যাপতি অকথ কথা
ইহ রস কেও কেও জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান ॥

মৈথিল এই পদটি বাংলাতে যেভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখানো গেল। এখানে সাধারণ বাঙ্গালী রসিক সমাজের নিকট ভাষার বেড়াজাল দূরে সরাইয়া বাঙ্গালীর রসোপভোগের উপযুক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

সজনি! অকথন কথন না যায়।

অওল অরুন	শশিক মণ্ডল	তাতর গেলি ছাপায় ॥ ধ্রু ॥
কদলী উপরে	কে হরি পেখলুঁ	কে হরি মেরু চঢ়েলা।
তহি উপরে	নিশাকর পেখলুঁ	তা পর কীর বসেলা ॥
কীর উপরে	কুরঙ্গিণী পেখলুঁ	চকিত ভ্রমরে জনি।
তা কর উপরে	ভঙর পেখলুঁ	ভঙর উপরে ফণি ॥
এক চৌন্ত	উর পেখলুঁ	বিবশ বিনা অরবিন্দা।
বিদ্যাপতি কহ	অবলা পেখলুঁ	যৈছন দুজক চন্দা ॥

এখানে প্রথমেই 'অকথ কহি ন জাএ'='অকথন কথন না যায়'-রূপে দেখা দিয়া একেবারে বাংলা রূপ লইয়াছে। তৃতীয় ছত্রে 'ভীতর রহ নুকাএ' সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া 'তাতর গেলি ছাপায়'-এ পরিবর্তিত হইয়াছে। পঞ্চম ছত্রে 'কেসরি মেরু চঢ়েলা'='কে হরি মেরু চঢ়েলা'-য় রূপান্তরিত। ভমএ=ভময়ে, দেখলে=পেখলুঁ-তে পরিবর্তিত। 'জল বিনা অরবিন্দা'='বিবশ বিনা অরবিন্দা'-য় পরিবর্তিত হইয়া যেরূপ নব-ভাবস্পন্দিত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্যে সন্দিগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই।

ভণিতাংশ গীতচন্দ্রোদয়ে নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। ভণিতাংশের পরিবর্তন বরাহনগরের ২২-সংখ্যক পুথির ষষ্ঠ পদেও আছে, তবে সেখানেও শিবসিংহ-রূপনরান-লছিমা পরিত্যক্ত হয় নাই।

ভনে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
রসজানে রসবন্তা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারয়ন
আ লছি দেবীক কন্তা॥

আসলে, বাঙ্গালীরা কবিকে আপনার প্রয়োজনে আপনার মতো করিয়া রচনা করিয়া লইয়াছেন। বিদ্যাপতিকে তাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন সত্য, আবার আশ্রিতের প্রশ্রয়ে বিদ্যাপতির নিত্যকাল-প্রতিষ্ঠা, ইহাও সত্য।

চার

রাগতরঙ্গিণীতে ধৃত বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদটি বাংলায় এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, যেন মনে হয় ইহা একটি স্বতন্ত্র পদ।

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে
ধিরে ধিরে মুরলী বোলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পাঠাব॥
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারী॥
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে নিকে আইতে জাইতে
জনি জনি পুছ বনবারি॥
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরজৌবতি
বন্দহ নন্দ কিশোরা॥ (পৃ. ৪৭ ; মি.-ম.—২৫৩)

রাগতরঙ্গিণীর এই পদে "নন্দের নন্দন কদম্বের তরুতলে (বসিয়া) ধীরে ধীরে

মুরলী বাজাইতেছেন। সংকেত সময় (জানিয়া) কুঞ্জে বসিলেন এবং বারে বারে সংবাদ (বংশীধ্বনি) পাঠাইতে লাগিলেন। হে শ্যামলি (সুন্দরি), তোমার জন্য মুরারি অনুক্ষণ বিকল (ব্যাকুল)। যমুনার তীরে উপবনে উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃপুনঃ ফিরিয়া দেখিতেছেন। বনমালী গোরস বিক্রয় করিতে যাইতে আসিতে গোপরমণীদের জনে জনে (তোমার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুমি বুদ্ধিমতী, মাধবও সুমতি; (অতএব) আমার কিছু বচন শুন। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর (মি.-ম. পৃঃ ১৭৬)।" এই ভাবকে কেন্দ্র করিয়া ভাষাকে আরও সংহত করিয়া বিদ্যাপতি ভণিতায় অপর যে পদটি বরাহনগর ১১-সংখ্যক পুথিতে (পদ ২৬) পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নন্দ নন্দন চন্দন তরুতলে
ধীরে ধীরে চলি যায়।
মদন সঙ্কেত নিকে তনি বলি
বলি সোহে পাঠায় ॥
তো লাগি বিকল শুন নারী।
যমুনাক তীর দুরগম ফিরি
ফিরি হেরত রসিক মুরারি ॥ ধ্রু ॥
গোরস বিকতহি বৈঠল ব্রজবধূ
কহ নহি পুছারি।
তুহুঁ অভিমান মান মতি মধুকর
গৌরব রাখি হামারি ॥
তুহুঁ যৈছে নায়রী তৈছে উহুঁ নায়র
ও তুহুঁ ভেল ভালে জান।
ভনহ বিদ্যাপতি রূপনারায়ণ ভজ
নন্দ নন্দন কান ॥

চন্দনতরুর মূলে নন্দ-নন্দন ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। মদনের সংকেত নিকেতন হইতে তাহাকে বলিয়া পাঠায়। হে নারী, তোমার জন্যই তিনি বিকল। যমুনার তীর দুর্গমে তিনি বারবার ফিরিতেছেন। গোরস

বিক্রয়কারিণী ব্রজবধূগণ বসিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের শুধাইতে পারেন (তোমারই কথা) না। তুমি তোমার মধুকর মান রাখিয়া আমার গৌরব রাখ। তুমি যেমন নাগরী, তিনিও তেমনি নাগর, তাহা তুমি বেশ জান। বিদ্যাপতি বলেন, তুমি সেই নন্দ-নন্দন রূপশ্রেষ্ঠ কানু ভজনা কর।

বিদ্যাপতির পদ অবলম্বন করিয়া যে এই পদটি রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতির ভাব আছে, ভাষা কিছু আছে, তবুও ইহা স্বতন্ত্র পদ। ইহাতে মৌলিক পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। যমুনাতীরে চন্দনবৃক্ষ জন্মে না এবং চন্দনবৃক্ষে কেহ বসিলে তাহার সর্পদষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে, সে-কথা বাংলার কবি সুগন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টির আগ্রহে ভুলিয়া গিয়াছেন।

বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদগুলির কৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে সত্য, কিন্তু প্রাচীন সংকলকগণ যে বিনা কারণে সেইগুলিকে সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নয়। বাংলা দেশে প্রাপ্ত 'না জানি রতি রস নাহি রতি রঙ্গ' পদটিকে মিত্র-মজুমদার সংস্করণে [৬৭০] বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদ-পর্যায়ে ধরা হইয়াছে। এই পদটি সম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' [১ম খণ্ড] গ্রন্থে [২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৯০] লিখিয়াছেন -"বিদ্যাপতি ভণিতা থাকিলেও ইহাতে বাঙ্গালীর অন্তরের সুরই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইয়াছে; 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি ইহার রচয়িতা হইতে পারেন না।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার মধ্যে স্পষ্ট বাংলা ভাষার ব্যবহার দেখিয়া মিত্র-মজুমদারের গৃহীত সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিয়াছেন, বিশেষত যখন পদ-মধ্যে শব্দ গ্রন্থনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর রসচেতনার প্রখরতা স্পষ্ট। মিত্র-মজুমদারের সিদ্ধান্ত যে দূরদৃষ্টি-প্রসূত, তাহা বরাহনগর ১২ সংখ্যক পুঁথির নিম্নোক্ত পদটি হইতে বুঝা যাইবে।

না জানি প্রেম রস নাহি রতি রঙ্গ।
কৈছে মিলা হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তুহাঁরি বচনে যব করোঁ প্রীত।
সো শিশুমতি অপযশ ভীত॥

সজনী হাম কি কথব তোয়।
সঙ্গম রভস কভু নাহি হোয়॥
নব নায়রী হাম পরশ না জান।
বিদ্যাপতি কহে চেতাব কান॥

অষ্টম ছত্রে ধৃত এই পদটি দ্বাদশ ছত্রে কিভাবে পরিণতিলাভ করিয়াছে, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। বলা বাহুল্য, শব্দগত পরিবর্তন তো আছেই, উপরন্তু সংযোজিত অংশে প্রথম সঙ্গমভীতা নায়িকার বিচিত্র অনুভূতি কবি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

না জানি প্রেম রস নাহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যব করব পিরিত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচশরে মদন মনোরথে জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জিউ নিকসব যব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥

ভাষাগত পরিবর্তন ও নায়িকা-চিত্তের সবিস্তার বর্ণনা প্রথম পদটির সহিত কিছু পার্থক্য আনিয়া দিয়াছে। এই পার্থক্য থাকিলেও পদটি যে মৈথিল কবির পদেরই রূপান্তর, তাহা অনস্বীকার্য। বিদ্যাপতির এই পদটিকে কেন্দ্র করিয়া আরও একটি পদ রচিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত পদটি হইতে পাওয়া যায়। এখানে কবি বিদ্যাপতির ভাবকে আরও বিলসিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির একটি ছত্রকে পুরাপুরি আত্মসাৎ করিয়াছেন। অপরাপর শব্দের সাহায্যও লইয়াছেন, সর্বোপরি বিদ্যাপতির ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ইহা রচিত।

তুহুঁ সখি পরাণ দোসর মোর।
তন মন জীবন আওতহি জোর ॥ ধ্রু ॥
জীউ দেই পূজব তনিক পিরিত।
হাম শিশু সতীমতি অপযশ ভীত ॥
শুনহে কি কহব নিকশে না বাত।
মান পরাণ সোপলুঁ তুয়া হাত ॥
না হয় অপযশ নবরস নাহ।
গুপতহি হোয়ত রভস নিরবাহ ॥
কহই বিদ্যাপতি ঐছন জান।
পহিরব কনক অভরন কান ॥ (বরাহ ২২।৩৯)

বাংলা দেশ বিদ্যাপতির পদসমূহকে আপনার মনের মতো করিয়া লইয়া রসোপভোগ করিয়াছে। বিদ্যাপতির ভাব তো আছেই, ভাষাও গ্রহণ করিয়াছে—তবে পরিবর্তিত রূপে। এই পরিবর্তনের ধারায় বিদ্যাপতির পদ অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া আজিও বাংলা দেশে প্রচলিত। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে বিদ্যাপতির একাদশ পদ হিসাবে নগেন্দ্র গুপ্তের ৬৫৫-সংখ্যক নিম্নোদ্ধৃত পদটি গৃহীত হইয়াছে। এ পদের রূপান্তর বাংলা দেশে কিভাবে হইয়াছে তাহা পরবর্তী আলোচনায় দেখানো হইতেছে। বিদ্যাপতির মূল পদটি যে মৈথিল পদ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব ॥
সাজনি রচহ মেহে উপাএ।
মধুমাস জঞো মাধব আবএ
বিরহ বেদন জাএ ॥
অচল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ
ধনু রিবাড়ল হাথ।
নাহ নিরদয় তেজি পড়াএল
ওডল হমর মাথ ॥

এক বেরি হরে ভসম কএলাহে
তুসহ লোচন আগী।
পুনু অহির কুল জনম লেলহ
বিরহি বধএ লাগি॥
জাঞো তোহি পাবওঁ অরে বিধাতা
বাঁধি মেলওঁ অন্দ কূপ।
জাহেরি নাহ বিচখণ নারী
তাঁকে কাঁ দিয় রূপ॥
আনকই রূপ হিত পত্র করএ
হমর ই ভেল কাল।
দিনে দিনে দুখ সহএ নপারঞো
পড়এ অধিক ভার॥

এই মৈথিল পদটি বাংলা দেশে কিভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহার যথার্থ পরিচয় রহিয়াছে পদরত্নাকরের ২৩-সংখ্যক পদে।

নিকুঞ্জ মন্দিরে গুঞ্জরে ভ্রমর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিণ পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কান্ত ন আব॥
সজনি বলহ হেন উপায়।
মধুমাসে যব মাধব আওব
বিরহ-বেদন যায়॥
অনঙ্গ যে ছিল অঙ্গ ভই গেল
ধনু শর করি হাথ।
নাহ নিরদয় ভাজি পলাওল
চড়ল হামারি মাথ॥
যে কুলে বিরহ ভসম করিল
তিসর লোচন আগি।
পুন হরি কুলে জনম লভিল
হমারি বধক লাগি॥

ভনে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
আকুল ন কর চিত।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী সহিত ॥

মৈথিল কবির 'সাহর মজর' এখানে 'নিকুঞ্জ মন্দিরে' রূপান্তরিত হইয়াছে সম্ভবত বৈষ্ণব কবির হস্তাবলেপে। 'এক বেরি হরে ভসম কএলাহে তুসহ লোচন আগী' সম্পূর্ণ বেশ বদল করিয়া 'যে কুলে বিরহ ভসম করিল তিসর লোচন আগি'-তে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার পরবর্তী চরণেও পরিবর্তনের ধারায় 'অহির কুল' 'হরিকুলে' পর্যবসিত হইয়াছে। সম্ভবত ইহা লিপিকর প্রমাদ। মৈথিল পদটির শেষের চারি চরণ বাংলা পদে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মৈথিল পদের ভণিতাংশটি নাই। বাংলা পদে শিবসিংহ-রূপনারায়ণ-লছিমাসহ কবি বর্তমান।

একটি অপ্রকাশিত পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। এই বাংলা পদটিতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই, কিন্তু ইহা যে বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদ হইতে গৃহীত ছত্রের সমন্বয়ে রচিত, তাহা বুঝা যায়। যে সকল পদের ছত্রের এই পদের সহিত মিল দেখা যায়, সেগুলির উল্লেখ নিম্নে করা গেল।

এ ধনি সুন্দরি সুন মঝু বাণী।
সোই মিলব তুহু সারঙ্গ পানি ॥
ধৈরয সমাধি রহবি বিমল মানি।
করে কর পরশিতে ঠেলবি পানি ॥
কুচ যুগ বসন হেরবি উর হেরি।
আপন বদন ঝাঁপবি বেরি বেরি ॥
যব পরশিতে জীউ উতরোল।
চমকি চমকি কহবি মৃদুবোল ॥
যব মুখ চুম্বনে লুবধ কিশোর।
লহু লহু হাসবি মুখ মোর ॥
হের পিয়া ওরবি নয়ন কজোর।
মনে জাগাইব হরি হসি ঘোর ॥

দলপতি ভূখল রস অবগান।
পহিল সমাগম নায়রি কান॥ (বরাহ ২২ , পদ ৫৯)

এই পদের প্রথম ছত্রের সহিত পদকল্পতরুর ১০৯-সংখ্যক পদের প্রথম ছত্র 'এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী', চতুর্থ ছত্রের সহিত পদকল্পতরুর ৪৯-সংখ্যক পদের পঞ্চম ছত্র 'পরসইত তুহুঁ করে বারবি পানি' (পদামৃত-সমুদ্রে এই ছত্রের পাঠান্তর আছে—পরসিত তুহুঁ করে ঠেলবি পানি।), পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রের সহিত মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ৬৬৭-সংখ্যক পদের 'বদন আধ বিনু সাধ ন পূরব, কুচ দরসাওব পাসে' কিংবা মিত্র-মজুমদারের ৬৬৮-সংখক পদের 'কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি·····ঝাঁপি দেখাওবি কুচ ওর', সপ্তম ছত্রের সহিত পদকল্পতরুর ৬৪-সংখ্যক পদের 'দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই। জিউ নিকসন যব রাখব কোই॥' প্রভৃতি অংশের সাদৃশ্য প্রায় ভাষাগত, ভাবগত তো বটেই। বাকী অংশ মিত্র-মজুমদারের ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৮৮, ৬৮৯ প্রভৃতি পদের সঙ্গে ভাবগত ও শব্দগতভাবে মিলিয়া যায়। বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদের পংক্তি চয়ন করিয়া সম্পূর্ণ একটি পদই রচিত হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের কাব্য-রসিকমণ্ডলী বিদ্যাপতির সুধাসমুদ্র হইতে নানাভাবে অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছেন, ইহা তাহারই সাক্ষ্য বহন করে।

'সুন সুন সুন্দর কহ্নাঈ' পদটির [মি·ম. ৬৭২] পাঠভেদ গীত-চন্দ্রোদয়, পদরত্নমালা এবং বরাহ ২২-সংখ্যক পুথির সহিত মিলাইলে, ইহার বাংলা রূপান্তরটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই পদকল্পতরুর পাঠ দেওয়া গেল।

সুন সুন সুন্দর কহ্নাঈ।
তোহে সোঁপল ধনি রাঈ॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহু সে ভূখল মধুকর॥
সহজ করবি মধুপান।
ভুলহ জনু পঁচবান॥

পরবোধি পয়োধর পরসিহ।
কুঞ্জর জনি সরোরুহ॥
গণইত মোতিম হারা।
ছলে পরসবি কুচভারা॥
ন বুঝএ রতি রস-রঙ্গ।
খন অনুমতি খন ভঙ্গ॥
সিরিস কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহব ফুল-ধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাব।
দূতিক মিনতি তুঅ পাব॥

গীতচন্দ্রোদয়ে কহ্নাঈ=কানাই, রাঈ=রাই, তুহু=তুহে, জনি=জনু, পরবোধি=প্রবোধি, কুঞ্জব জনি=কুঞ্জবে দিনু, গণইত=গণইতে, হারা=হার, ভারা=ভার, ন=না, খন=খেনে, সহব=সহবি, গাব=গায়, তুঅ পাব=তুয়া পায় প্রভৃতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর উচ্চারণগত সারল্যের সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। পদরত্নমালার উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর অষ্টম ছত্রে 'কুঞ্জর জনি সরোরুহ' স্থলে 'কুঞ্জর ন ভেল সরোরুহ'। এই পদটির উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটিয়াছে বরাহনগর ২২-সংখ্যক পুথির পদে (৬০)। এই পদের সপ্তম ছত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত পাঠান্তর দেখা যায়।

পয়বোধি পয়ো যুগচালা।
কুঞ্জর পরজোরি মৃণালা॥
বুঝি এ রতি রস সঙ্গ।
খেনে মাতি খেনে দেই ভঙ্গ॥
কমলে মধুকর জনু পান।
কবি বিদ্যাপতি গান॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১-সংখ্যক পুথিতে এই পদের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ ছত্রের নিম্নরূপ পাঠ আছে।

শিশির কুসুম জিনি তনু।
থোরে বিজুরী ফুলধনু॥

শব্দগত বিশুদ্ধতা এখানে আর রক্ষিত হয় নাই। এইভাবে বিদ্যাপতির পদসমূহের রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়াই বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর প্রাণের কবি, চিরকালের কবিরূপে স্বীকৃত।

পাঁচ

রাগতরঙ্গিণীর 'আকুল চিকুর বেঢ়ল মুখশোভ' পদটির বাংলায় বিভিন্ন পর্যায়ে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা লক্ষণীয়। রাগতরঙ্গিণী হইতে মূল পদটি [পৃ. ১০২-১০৩] উদ্ধৃত হইল।

আকুল চিকুর বেঢ়ল মুখশোভ।
রাহু কএল শশিমণ্ডল লোভ॥
উভরল কুসুম মালধর অঙ্গ।
জান যমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ॥
বদন সোহাওল শ্রমজল বিন্দু
মদনে মোতিমএ পূজল ইন্দু।
পিয় মুখ সুমুখি চুম্ব ভোজ ভরে।
চাঁদ অধোমুখ পিবএ সরোজ॥
কণ্ঠ বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনক কলস বম দুধক ধার॥
কিঙ্কিনি শব্দ নিতম্বিনী চাজ।
মদন বিজয় রথ বাজন বাজ॥
ভনই বিদ্যাপতি মনে অনুমানি।
কামিনী রস পিআ অনুমত জানি॥

এই পদটি ক্ষণদায় গৃহীত হইয়াছে। পদটির প্রথম ছত্রেই একটি শব্দগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'আকুল চিকুর' স্থলে 'আকুল অলক', তৃতীয় ছত্রে 'উভরল কুসুম মালধর অঙ্গ' স্থলে 'কুণ্ডল-কুসুম-মালে করত অঙ্গ'। চতুর্থ ছত্রের পরেই দুইটি নূতন ছত্র সাধক বা ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে।......

বড় অপরূপ দুহুঁ চেতন মেলি।
বিপরীত সুরত কামিনী করু কেলি॥

ইহার পর হার=হারা, ধার=ধারা, শব্দ=শবদে, ছাজ=সাজ প্রভৃতি পরিবর্তন আছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে ভণিতাংশে,......

ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কাম-কলা জিনি বচন-চামারি ॥

বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরুতে এই পদের পরিবর্তন প্রচুর। এমন কি প্রথম ছত্রদ্বয় এই পদে নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্র ভণিতার উপরে স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে পদটির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া গেল।

বদন সোহায়ল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু ॥
প্রিয় মুখ সমুখহি চুম্বন ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥
রতি-বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনকলতা পরি দুধক ধার ॥
কিঙ্কিনি শবদ নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজই রণ-বাজন বাজ ॥
বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ।
জনু থামুন জলে গঙ্গ-তরঙ্গ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি এহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠান ॥

'মদন মোতি লএ' স্থলে 'মদন মোতি দেই', 'চুম্ব' স্থলে 'চুম্বন', 'পিয় মুখ সুমুখি' স্থলে পুরাপুরি বাংলা 'প্রিয় মুখ সমুখহি', 'কুচ বিপরীত' স্থলে 'রতি-বিপরীত', 'কনক কমল রস দূধক ধার' স্থলে 'কনকলতা পরি দূধক ধার', 'নিতম্বিনী ছাজ' স্থলে 'নিতম্বহি সাজ', 'মদন বিজইরথ' স্থলে 'মদন বিজই রণ', 'উভরল কুসুম' স্থলে 'বিগলিত চিকুর' প্রভৃতি পরিবর্তন বিদ্যাপতির মৈথিল পদকে ধীরে ধীরে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়াছে। ভণিতাগত রূপান্তর মাধুর্যের পরিপোষক। কবির নামে রসিকসমাজ তাঁহাদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন।

ছয়

গ্রীয়ার্সন-সংগৃহীত 'কি কহব এ সখি কেলি বিলাসে' পদটি পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, নগেন্দ্র গুপ্তের তালপত্রের পুথিতে এবং বরাহনগরের ২২-সংখ্যক পুথিতে [পদ ৬৮] আছে। গ্রীয়ার্সন-সংগ্রহ ছাড়া অন্যান্য সংগ্রহে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত দুইটি ছত্র পাওয়া যায়।

শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥

বরাহনগর পুথিতে [২২।৬৮] এই ছত্রদ্বয়ের কিছু পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়—

শুনত নাহি পহু লহু লহু ভাস।
দুহুঁ দুহুঁ হেরইতে উপজল হাস॥

ইহা ব্যতীত, ভাষাকে বাংলায় রূপান্তরিত করার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। 'ঘামবিন্দু মুখে সুন্দর জোতী' পরিবর্তিত হইয়াছে 'শ্রমজল-বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি'-তে, 'কনক কমল জনি ফরি গেলি মোতী' 'কনককমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি'-তে। বরাহনগর পুথিতে এই দুই ছত্র নিম্নরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রমজল বিন্দু সুন্দর জ্যোতি।
হেম কমলে জনু ফুটল মোতি॥

মূল পাঠ অপেক্ষা ইহার সৌন্দর্য অধিক।

বিদ্যাপতির পদাবলীর বাংলা রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভণিতাগত পরিবর্তন প্রায় বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পদকল্পতরুর ভণিতা গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহের সহিত অভিন্ন নয়।

ভণহুঁ বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
নহিলে রসিক কৈছে তোহারি মুরারী॥

আবার বরাহনগরের ২২-সংখ্যক পুথির ভণিতা—

কুচযুগ কনক ধরা ধর জান।
অপরূপ মুরতি বিদ্যাপতি ভান॥

সাত

নেপাল পুথির 'নীন্দে ভরল অছ লোচন তোর' পদটির বাংলা রূপান্তর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ, এই পদের ভাষা যেমন মূল পদ হইতে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তেমনি ভাবের ক্ষেত্রেও যে রূপান্তর একেবারে নগণ্য, তাহা নয়। নিম্নে নেপাল পুথির পদটি উদ্ধৃত হইল।

নীন্দে ভরল অছ লোচন তোর।
কোমল বদন কমল-রুচি-চোর॥
কঞোনে কুবুধি কুচ খিখত দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভএ গেল॥
কেস কুসুম ঝ সিরক সিন্দুর।
অলক তিলক হে সেহও গেল দূর॥
নিরসি ধূসর ভেল অধর পবার।
কঞোনে লুলল সখি মদন ভঁড়ার॥
ভনই বিদ্যাপতি রসমতি নারি।
করএ পেম পুনু পলটি নেহারি॥

পদকল্পতরুতে (২৭০) রূপান্তরিত আকারে পদটি নিম্নরূপ—

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি কলা সব কহবি মোয়॥
বেশ যুগ তোর সব ছিল পূর।
অলকা-তিলক মিটি গেলহি দূর॥
কুসুম-কুল সব ভেল ভিন ভীন।
অধরহি লাগল দশনক চীন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈগেল॥
অলসহিঁ পূরল সকলহিঁ গা।
বসন সেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সরবস লেয়ল রসিক মুরারী॥

বাংলা পদটির নবম ও দশম ছত্রে যথাক্রমে 'সকলহিঁ গা' এবং 'ঘন ঘন কর বা' নিতান্ত বাংলা ভাষার পরিচয় প্রকাশ করে এই ছত্র দুইটি মূল পদে নাই। এই সংযোজন পদটির গৌরব হানি করে নাই। মূল পদের ভণিতার শেষ ছত্রটিও এখানে পরিবর্জিত। মূল পদের এই চরণে ব্যঞ্জনার গৌরব নিঃসন্দেহে উচ্চমানের, তবে রসিক মুরারী তাহাকে সর্বরিক্ত করিয়াছে, তাহার বেদনা ও আনন্দ একই সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাও নিম্নমানের হয় নাই।

আট

'এ ধনি সুন্দরি শুন মঝু বাণী' পদটির বিচারে দেখাইয়াছি বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদের ছত্রসমূহ একত্রিত করিয়া পদটি রচিত। বরাহনগর পুথির (২২/১-১) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩১ সংখ্যক পুথির পাঠ অনুসারে নিম্নের পদটি উদ্ধৃত হইল।

শুনইতে মাধব মথুরা গেল।
গোকুলক মনিক কো হরি নেল॥
হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা।
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।
সুখ গেল পিয়া সঙ্গে দুখ হাম পাশ।
নয়নের নিন্দ গেল বয়ানের হাস॥
শুন ভেল দশ দিশা শুন ভেল নগরী।
শুন ভেল মন্দির শুন ভেল সগরী॥
ভণ [illegible] বরনারী।
ক [illegible] দিন দুই চারি।

এই পদটি পদকল্পতরুর ১৬৩৯ [illegible] ১৬৪১ পদদ্বয়ের সমন্বয়ে রচিত। ১৬৩৯ পদ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং নবম ও দশম ছত্র গৃহীত। ১৬৪১-সংখ্যক পদ হইতে বাকী অংশটি লওয়া হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদ এখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাবের ন্যূনতা কোথাও নাই। এই

একইভাবে বরাহনগর ২২ পুথির ১০৪-সংখ্যক পদটিও রচিত হইয়াছে। পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া কোন্ পদ হইতে ইহার ছত্রগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তাহার সহিত নূতন অংশ যোগ করিয়া কিভাবে পদটিকে নব রূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি।

গোকুল উপজল করুণা রোল।
নয়নের জলে সখি বহই হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী॥
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥
বিনা দোষে মাধব মাথুর গেল।
নয়নক পুতলি কোন হরি লেল॥
কৈছে চলব যমুনাক তীর।
অব কৈছে হেরব কুঞ্জ কুটির॥
হরি বিনু কৈছে যাওব সোই ঠাম।
ধনু ধরি যাহো বৈসে দারুণ কাম॥
কৈছে সখি যাওয়ন নিভৃত নিকুঞ্জে।
যাহা ভ্রমরীভ্রমরগণ গুঞ্জে॥
সো হরি যাহা করল ফুলয়ারি।
কৈছে জীউ রাখব তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ ভান।
লছিমা কয়ন্ত দুখ নরসিংহ জান॥

এই পদটির প্রথম চারি ছত্র, সপ্তম ও অষ্টম ছত্র এবং নবম হইতে একাদশ ছত্র পদকল্পতরু [১৬৩৯] 'সব মথুরা পুর গেল' পদ হইতে গৃহীত। পদকল্পতরুর সম্পূর্ণ পদটিই এই পদের অন্তর্বর্তী। বাকী অংশ নূতন সংযোজিত হইয়াছে। মূল পাঠে যেখানে "সহচরি সঞে জঁহা করল ফুলবারি। কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি॥" আছে, এই পদে তাহা রূপান্তরিত হইয়া "সো হরি যাহা করল ফুলয়ারি। কৈছে জীউ রাখব তাহে নেহারি॥"-তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

নয়

নেপাল পুথির 'আলসে অরুণ লোচন তোর' [ঝা, ১০৬] পদটি বাংলাতে রূপান্তরিত অবস্থায় বেশ কিছুটা কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। শুধু কলেবর-বৃদ্ধি নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত পরিবর্তনও যে কম হয় নাই, তাহা পদ দুইটিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

আলসে অরুণ লোচন তোর।
অমিঞে মাতল চঁন্দ চকোর॥
নিচল ভঁউহ লে (অ) বিসরাম।
রন জিনি ধনু তেজল (জনি) কাম॥ ধ্রু॥
এরে রে রাধে ন কর লথা।
উকুতি গুপত বেকত কথা॥
কুচ সিরিফল করজ সিরী।
কেসু বিকসিত কনক গিরি॥
অলক বহল উধসু কেশ।
হসি পলিছল কামে সন্দেশ॥

দশম ছত্রের এই পদটি বরাহনগর ২২ পুথির ১৯৩-সংখ্যক পদে ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চতুর্দশ ছত্রের পদে পরিণতিলাভ করিয়াছে।

অলসে অবশ লোচন তোর।
অমিঞা মাতল চাঁদ চকোর॥
এ তুয়া লোচন ভাঙক ঠাম।
রণ জিতি ধনু তেজল কাম॥
আরে রে সুন্দরি সঙ্গম লতা।
উকতে বেকত গোপত কথা॥
কুচশ্রীফল ঝমরি তোরি।
কি সুখে দংশল কনয়া গিরি॥
কাজর সিন্দুর মেটহিঁ গেল।
মু হরি তুরিয়া কে ধন লেল॥
কুসুম কুন্তল তোহার গাতে।
হারে তোরে গাঁথল কেবা বিপরীতে॥

পরশ করিয়া বিদ্যাপতি ভান।
রসিক জন সে যে রস জান ॥

নেপাল পুথিতে ভণিতাংশ নাই, শুধুমাত্র 'বিদ্যাপতীত্যাদি' আছে। বরাহনগর-পদে পূর্ণ ভণিতা। বরাহনগরের পদের শেষের ছয় ছত্র নূতন। ইহাতে ভণিতা আছে এবং ভণিতার মধ্য দিয়াই ইহা যে বাঙ্গালী কবির রচনা, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। মৈথিল কবি 'পরশ করিয়া বিদ্যাপতি ভাণ' এরূপ কখনো লেখেন নাই। রূপান্তরিত করিতে গিয়া পদটির মৈথিল শব্দ প্রায় নির্বিচারে পরিবর্তন করা হইয়াছে। অবশ্য, এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অনেকক্ষেত্রে নবতর ব্যঞ্জনার প্রকাশ দেখা যায়। 'অলসে পুরল' অপেক্ষা 'অলসে অবশ' নিঃসন্দেহে অধিক কবিত্বময়। 'নিচল ভৌঁহ লে (অ) বিসরাম' পরিবর্তিত হইয়াছে='এতুয়া লোচন ভাঙক ঠাম'-এ। 'রাধে না কর শুথা'>'সুন্দরী সঙ্গম লতা' বাঙ্গালী রস-চেতনার নিকট অধিক কবিত্ব-রসসঞ্চারী। 'কুচ সিরিফল করজ সিরী' 'কুচ শ্রীফল ঝমরি লোরি'-তে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, 'কনক গিরি', 'কনয়া গিরি' প্রভৃতি ঈষৎ রূপান্তর তো আছেই। নূতন অংশে কবি যে বাঙ্গালী তাহার বলিষ্ঠ প্রমাণ রহিয়াছে ভণিতাংশে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া, কোন মৈথিল কবি 'কুসুম কুন্তল তোহার গাতে' লিখিবেন না। মোটকথা, বিদ্যাপতির রচনাই এই পদের অবলম্বন। তবে এই অবলম্বনীয় বিষয়ে এদেশের কবির শক্তিও রসপরিচয়-যুক্ত হইয়াছে।

দশ

পদামৃতসমুদ্রের (১৯১) এবং পদকল্পতরুর (৫৩০, ২০৪৪) 'তোহারি বিরহ বেদনে বাউর' পদটি বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ। এই পদটি বাংলা দেশের মরমিয়া সাধকগণ তাঁহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। বহু প্রচারণায় যে ইহার রূপ পরিবর্তন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তাহারই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে পদটির নব রূপান্তরে। এই রূপান্তরের বিচিত্র রীতির সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বে মূল পদটি পদামৃতসমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইল।

তোঁহারি বিরহবেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খেণে অচেতন খেণে সচেতন
খেণে নাম ধরু তোর॥
রামা হে! তোঁ বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ নেহ॥ ধ্রু॥
তোঁহারি কাহিনি কহিতে জাগই
সুতই দেখই তোই।
না ঘর বাহিরে ধৈরয না রহে
পথ নিরখই তোই॥
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন পান।
কাঠমুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

এই পদটিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩১-সংখ্যক পুথিতে রহিয়াছে। এই পুথির পাঠেও যেমন রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়, তেমনি চরণ-সংস্থানের ক্ষেত্রেও কিছু বৈচিত্র্য আছে। প্রথমেই সুন্দর মাধব বিরহ বেদনে পাগলের মতো হইয়াছেন না বলিয়া, পদটিতে কঠিনপ্রাণা রামাকে বেদনা-ক্ষুব্ধ অনুযোগ করিয়া কবি নিবেদন জানাইতেছেন—

বামা তোঁ বড়ি কঠিন দেহা।
গুণ আগুণ না বুঝি তেজলি
জগত দুলহ নেহা॥
তোহারি বিরহ বেদন বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খেনে অচেতন খেনে সচেতন
খেনে নাম ধরু তোর॥
তোহারি কাহিনী দিবস যামিনী
নিন্দই দেখই তোয়।
ঘর বাহির চিত নহে থির
সজল নয়নে রোয়॥

শতেক বোধিয়ে বোধ না মানয়ে
না করে ভোজন পান।
কাঠক মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

কবির সমস্ত প্রাণ যেন বেদনার রসে ঝরিয়া পড়ে। মাধবের বিরহ-চিত্র পূর্বেই প্রকাশ না করিয়া, বামার প্রতি এই করুণ মিনতি পদের চরণ-সংস্থানে নবতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। মূল পাঠের 'তোহার কাহিনি কহইত জাগয়, সুতই দেখয় তোয়' স্থলে রূপান্তরিত পদের 'তোহারি কাহিনী দিবস যামিনী নিন্দই দেখই তোয়' অধিকতর শ্রুতিমধুর অবশ্য, পরবর্তী অংশে 'পথ নিরখয়ে রোয়', 'সজল নয়নে রোয়' অপেক্ষা অধিকতর ব্যঞ্জনাময়। রূপান্তরিত পদটি বাঙ্গালীদের নিকট শ্রুতি-সুখকর। ভাব এবং ভাষা—বিদ্যাপতির। কিন্তু মৈথিল কবির কাব্য রসাস্বাদন করিয়া বাঙ্গালী কবিকে তথা তাঁহার রচনাকে আপনার মনের মতো করিয়া সাজাইয়া লইয়াছে বা অনেকক্ষেত্রে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে বিদ্যাপতির বাংলা পদে তিনি ক্ষণে মৈথিল আবার ক্ষণে বাঙ্গালী।

এগারো

ক্ষণদাগীতচিন্তামণির 'শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ' পদটির বাংলায় রূপান্তর ঘটিয়াছে। ক্ষণদার প্রাচীন পাঠ রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে প্রায় নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। আবার, গীতচন্দ্রোদয়ে এই দশম ছত্রের পদটি চতুর্দশ ছত্রের পদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথমে ক্ষণদার পাঠ নিম্নে দেওয়া গেল এবং পরে তাহার রূপান্তর কিরূপ হইয়াছে, তাহাও দেখানো গেল।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেওব তোহে উপদেশ॥
পহিলহিঁ বৈঠকি শয়নক সীম।
হেরি পিয়া মুখ মোড়বি গীম॥

পরশিতে দুই করে ঠেলবি পাণি।
মৌন করবি পিয় পুঁছইতে বানী॥
বহুবিধ চাটু করয়ে যদি নাহ।
বিহসি বুঝাওবি রস-নিরবাহ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কাম গুরু হোই শিখাওব পাঠ॥

ক্ষণদা ৫৩, মিত্র-মজুমদার ৬৬৬

পদামৃতসমুদ্রে বিদ্যাপতির এই পদটির ভাব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এমন কি খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগও পদটিতে নাই, যদিও শব্দগত পরিবর্তন পদমধ্যে প্রচুর। অবশ্য, এই শব্দগত পরিবর্তন মৈথিল শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। নিম্নে পদামৃতসমুদ্রের (পদ ১২০) পাঠ দেওয়া হইল।

হাম শিখায়ব বচন বিশেষ।
পহিরণ অম্বরে ঝাঁপিবি কেশ॥ ধ্রু॥
পহিলহি জাওবি শয়নক ওর।
আধ নেহারবি বঙ্কিম থোর॥
যবে পিয়া করে ধরি লেউ নিজ পাশ।
মৌনে রহবি ধনি গদ গদ ভাষ॥
পিয়া পরি রস্তনে মোড়বি অঙ্গ
নহি নহি বোলবি নয়ন বিভঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কি কহব হাম।
আগে গুরু হোই শিখায়ব কাম॥

বলা বাহুল্য, পদামৃতসমুদ্রের পাঠে ক্ষণদার সবই আছে, তথাপি ইহা যেন এক স্বতন্ত্র পদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। পদকল্পতরু (৪৯)-তে ক্ষণদার পাঠই গৃহীত হইয়াছে, তবে ভণিতার পূর্বের চরণটি স্বতন্ত্র,—

যব হম সোপব করে কর আপ।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥

বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর রূপান্তর রস-রুচির প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে একই ভাষায় শব্দগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ঘটিয়াছিল। এই পদটির রূপান্তর সেই শ্রেণীর। তবে অধিকাংশ রূপান্তরেই বাংলা

ভাষার প্রভাবই মূল বৈশিষ্ট্য। গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত 'কত অনুনয় অনুগত অনুরোধি' পদটি একেবারে প্রায় সাদা বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। নিম্নে প্রথমে গ্রীয়ার্সনের পাঠ এবং পরে রূপান্তরিত পাঠ দেওয়া গেল।—

কত অনুনয় অনুগত অনুরোধি।
পতিগৃহ সখিহি সোহওলি বোধি॥
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোই।
ভাগল দল বহুলাবএ কোই॥
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেলি ন মিলএ দেলহু হিম কোটি॥
গুরুজন পরিজন তুঅও নেবার।
মোহর সুনল অছি মদন-ভঁড়ার॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা বিরমান॥

গ্রীয়ার্সনের পাঠের কিছু অতিরিক্ত মিলিয়াছে নগেন্দ্র গুপ্তের তালপত্রের পুথিতে। তৃতীয় চরণের পর হইতে নিম্নোদ্ধৃত চারিটি চরণ পাওয়া যায়।—

বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ॥
ভুজ-কুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ॥
লগ নহিঁ করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥
এতদিন সৈসব লাওল সাঠ।
অব ভএ মদন পঢ়াওব পাঠ॥

গুপ্ত মহোদয়ের অতিরিক্ত পাঠ মৈথিল ভাবকে আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হইয়াছে। এখানে বাংলায় রূপান্তরের স্পর্শ নাই। ভাব মৈথিল ভাষাতেই বিকশিত হইয়াছে মাত্র, ভাষার বৈশিষ্ট্য এখানে লঙ্ঘিত হয় নাই। কিন্তু এই পদটিই পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথিতে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন রূপে বাংলা ভাষায় দেখা যায়। গ্রীয়ার্সনের তৃতীয় চরণ এখানে প্রথম চরণে পর্যবসিত।

বালম্ভু রসিক বিলাসিনী ছোটি।
মেরুন মিলয়ে দিনেহি ধন কোটি॥
কত অনুরোধি আনল পরবোধি।
রতি গৃহে সখিনি স্বভাবলে বোধি॥
সুতলী বিমুখী ধনি অতি খিন হোই।
ভাঙ্গল দরবহুঁ ভাবই কই॥
আচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ভরে শশি বেকত ন হই॥
নগনাহি সরয়ে শুনয়ে নাহিঁ বোল।
কর এক বেরি করহিঁ কর ঘোর॥
দুহু ভুজ চাপি জীবধন সাঁচে।
কুচ কাঞ্চন কোরি ফল কাঁচে॥
দরশন পরশন দুরয়ে নিবারে।
মুহরে মুদল আছে মদন ভাণ্ডারে॥
এতদিন সখীসব আছলি ঠাঠে।
অবগহিঁ সরএ মদন পঢ়ায়ল পাঠে॥
সুকবি বিদ্যাপতি রস ভানে।
ইহ রস রাখিয়া দেই পরমাণে॥

গ্রীয়ার্সনের পাঠের দশম ছত্র নগেন্দ্র গুপ্তের পাঠে অষ্টাদশ ছত্রে পরিণত হইয়াছিল। বাংলায় রূপান্তরিত পদটি চতুর্দশ ছত্রের। এখানে 'বালম্বু বেসনি বিলাসিনী' = 'বালম্ভু রসিক বিলসিনী'তে, 'ভুজযুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ' = 'দুহু ভুজ চাপি জীবধন সাঁচে' পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রায় বাংলার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে 'দরশন পরশন দুরয়ে নিবারে' আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ছত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ঈষৎ ভাবগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'এতদিন সখীসব আছলি ঠাঠে'। 'শৈশব', 'সখীসব'-এ আসিয়া ভাবের ব্যাপকতা ঘোষণা করিয়াছে। এইভাবেই বিদ্যাপতির মৈথিল পদ বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালী রসচেতনার আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে।

বারো

বিদ্যাপতির মৈথিল পদসমূহ বাংলায় রূপান্তরিত হওয়ায়, হিন্দীভাষী পণ্ডিতগণ সেই পদগুলিকে সাধারণত অবহেলার দৃষ্টিতে আলোচনা করেন বা উপেক্ষা করেন। বিদ্যাপতির কাব্যতরণী কালের বন্দরে নিত্যদিন তাহার অমৃত রস বিতরণ করিয়া চলিয়াছে। যুগ-জীবনের নিয়ত পরিবর্তিত রসসত্রে তাহার নিত্য বর্ষণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সত্য; তাই বলিয়া তাহার পদসমূহের প্রাচীনতম বিশুদ্ধতা যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহার কোন কারণ নাই। বরং বলা যাইতে পারে, 'অক্ষুণ্ণতা' না থাকাটাই তাহার যুগোত্তীর্ণতার বড় প্রমাণ। তাহা ছাড়া, বিদ্যাপতির পদের কোন্‌টা প্রাচীন বা বিশুদ্ধ রূপ, তাহা আজিও নির্ণয় করা যায় না। বিদ্যাপতির পদ-বিচারের ক্ষেত্রে নেপাল পুথি, রাগতরঙ্গিণীর পাঠ, রামভদ্রপুরের পুথি এবং গ্রীয়ার্সনের সংগৃহীত পদের পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। পূর্বেই দেখাইয়াছি, এই সকল প্রাচীন পাঠের একটির সঙ্গে অপরটির অভিন্নতা নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির একটি বহু-খ্যাত পদের পরিচয় বিচার করিয়া দেখাইতেছি। 'কামিনী করএ সিনানে' পদটি বিদ্যাপতির বিশেষ প্রসিদ্ধ পদ। ইহা নেপাল পুথি, রাগতরঙ্গিণী, গ্রীয়ার্সন-সংগ্রহে পাওয়া যায়। এই তিনটি প্রাচীন পাঠ যথাক্রমে উদ্ধৃত করিয়া, তাহারই পাশাপাশি পদকল্পতরুর পাঠ উদ্ধৃত করা হইল। তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, বিদ্যাপতির কোন বিশেষ পাঠের উপর আমরা গুরুত্ব দিই না; স্থান এবং কালের পটভূমিকায় বিদ্যাপতির পদের রসাস্বাদন করি। যদি রসগ্রহণই মুখ্য বিষয় হয়, তবে বিদ্যাপতির বাংলায় রূপান্তরিত পদগুলি সম্পর্কে বলিবার বিশেষ কিছুই থাকে না। হিন্দী পণ্ডিতগণ নিম্নোক্ত প্রাচীন পাঠত্রয়ের কোন্‌টি বিদ্যাপতিরপদের আদি এবং অকৃত্রিম পাঠ বলিবেন, তাহা তাঁহারাই বোঝেন।

নেপাল পুথির পাঠ—

কামিনি করএ সনানে।
হেরইতে হৃদয় হরএ পচবানে॥

চিকুর গলএ জলধারা।
সমুখ শশি ভরে জোনি রোঅএ অন্ধারা॥
তিতল বসন তনু লাগ্।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগ্॥
তেঁ সঙ্কাএে ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরি ধরিঅ পুনু উড়ু তরাসে॥
কুচজুগচারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিত আনি কএোনে দেবা॥

(ভণই বিত্তাপতীত্যাদি)

রাগতরঙ্গিণীর পাঠ—

কামিনী করএ সনানে।
হেরিতহিঁ হৃদয় হন পঁচবানে॥
চিকুর গরএ জল ধারা।
মুখসসি ডরে জনি রোঅএ অধারা॥
তিতল বসন তনু লাগু।
মুনিহুঁক মানস মনমথ জাগু॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা॥
তে সঙ্কাএ ভুজপাসে।
বান্ধি ধয়িঅ উড়ি জাএত অকশে॥

(ত বিত্তাপতেঃ)

গ্রীয়ার্সন-পাঠ—

কামিনী করু অসনানে
হেরইত হিয়ে হনল পচমানে॥
তিতল বসন তন লাগু
মনিহুক মন সমস্ত ভয় জাগু॥
চিকুর বহে জল ধারে
জনি শশি বিহু মোহি লাগত অন্ধারে॥
কুচ যুগ চারু চকেবা।
নীজ কর কমল জানি ছুথ দেবা॥

তে সঁগে ভুজ ফাঁসে
বাঁধি ধরিঅ উড়ি লাগত অকাসে ॥
ভণহি বিদ্যাপতি ভানে
সুপুরুখ কবহু ন হোয়ত নদানে ॥

পদকল্পতরুর পাঠ—

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জলধার।
মুখ-শশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার ॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুলে আনি মিলায়ল দেবা ॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উডব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতি নারি রসিকজন পাওয়ে ॥

একই পদের প্রাচীন পাঠান্তরসমূহে কোনটির সঙ্গে কোনটির পরিপূর্ণ মিল নাই। প্রতি ক্ষেত্রেই ভাষাগত পরিবর্তন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নয়, ভাষাগত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া ভাবেরও কিঞ্চিৎ অবনতি বা কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়। যেমন—নেপাল পুথির 'সমুখ শশি ডরে জনি রোঅএ অন্ধারা' ছত্রটি রাগতরঙ্গিণীতে হইয়াছে 'মুখসসি তরে জনি রোঅএ অধারা'। আবার এই ছত্রটিই গ্রীয়ার্সন পাঠে 'জনি শশিবিম্ব মোহি লাগত অন্ধারে' এবং পদকল্পতরুর পাঠে 'মুখ-শশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার' হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাবের মাধুর্যে পদকল্পতরুর বক্তব্য এবং প্রকাশ নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। কিন্তু ইহাকে বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদাবলী বলা হইবে কিনা, তাহাই প্রশ্ন। পূর্বেই দেখাইয়াছি, বিদ্যাপতির পদাবলীর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ, প্রাচীন পাঠের মধ্যেই যেখানে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নাই এবং কোনটির সঙ্গে

কোনটির আনুপূর্বিক সাদৃশ্য নাই এবং কোন্‌টি যে অকৃত্রিম তাহা বলা যায় না, সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কোন পদকেই একেবারে খাঁটী এ অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। বিদ্যাপতির পদ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই রূপান্তরিত হইয়াছে। এই রূপান্তর-কার্যে নানা কবির হস্তাবলেপ পড়িয়াছে এই বিদগ্ধ কবির রচনায়। ইহার পর আছে মহাকালের নিরন্তর গতিধারা, যাহার অমোঘ স্পর্শে পুরাতন আর পুরাতন থাকে না, নূতনের বেশে আসিয়া সে মুগ্ধ করিতে চায়। প্রাচীন শব্দ পরিবর্তিত বেশে আধুনিক রূপে দেখা দেয়। বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের এইভাবে রূপান্তর ঘটিয়াছে। মৈথিল কবিকে বাংলা দেশ তাহার অন্তর-লোকে নিত্যকালের প্রাণের কবিরূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। বিদ্যাপতির পদ-রূপান্তরের ক্ষেত্রে বহু বাঙ্গালী হৃদয়ের কাব্যরুচি জড়িত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল কবিকে আজ আর চিনিবার উপায় নাই। তবে বিদ্যাপতির চিরনূতনত্বের ঐশ্বর্যে তাঁহারা যে শিরোভূষণ না হইলেও অঙ্গভূষণরূপে আপনাদের সম্পদ্ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা অনস্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা দেশে রচিত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদের আলোচনা

বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ বাংলা দেশে প্রচলিত তাহার সবই যে মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা নয়, তাহা "বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা পদের সম্ভাব্য রচয়িতাগণ" শীর্ষক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। সাধারণত বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কথা উঠিলেই আমরা 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি' সেই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের কথাই মনে করি কবিরঞ্জন সম্পর্কে ইতিপূর্বেই ঐ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সেইজন্য এখানে আর তাঁহার সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন নাই। বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদ এবং যে পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষার কিংবা অনেকক্ষেত্রে শুধুই ভাবের যেখানে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সেই পদ-গুলিকে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচিত না বলিয়া উপায় নাই। অবশ্য, এই বাঙ্গালী বিদ্যাপতি যে কোন একজন ব্যক্তিমাত্র তাহা বলা যায় না। বাংলা দেশেরই হয়তো বহু কবির কবিকর্ম বিদ্যাপতির নামের তরণীতে একালের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত এই শ্রেণীর পদের 'আলোচনা'য় প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে, এগুলির এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, যাহা দ্বারা এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে অ-বিদ্যাপতির তথা বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বাংলা দেশের কবিগণেরই রচিত বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতে হইলে, এই শ্রেণীর পদের আলোচনা না করিলে ইহার যথার্থ উত্তর পাওয়া যাইবে না। বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত বাংলা দেশের পদসমূহ বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। মৈথিল-বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী। ফলে, চৈতন্য ভাবাশ্রয় তাঁহার পদে সম্ভব নয়। বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতি ভণিতায় যখন শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সেগুলিকে আর চৈতন্য-পূর্ববর্তী মৈথিল কবির রচনা বলা যায় না। মৈথিল বিদ্যাপতির পদে 'শ্যাম' নামের ব্যবহার নাই। রামভদ্র-

পুর, রাগতরঙ্গিণী, গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি সংগ্রহের পাঠে কোথাও শ্যাম নাম ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাক্-চৈতন্য পদ-সাহিত্যে 'সামর' [=শ্যামল] শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা শ্যামদেহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন রূপে প্রাক্-চৈতন্যকালে দেখা দেয় নাই। তাহা ছাড়া, মৈথিল বিদ্যাপতির কোন পদেই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। সুতরাং যখন বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে এই নামের ব্যবহার দেখা যায়, তখন তাহা বাংলা দেশেরই কবির পদ, বিদ্যাপতির নামে সংযুক্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। 'বৃষভানু' প্রয়োগ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গালী কবি যখন মিশ্র হিন্দী ও বাংলাতে পদ রচনা করিতে গিয়াছেন, তখন ভাষার সেই কৃত্রিম ব্যবহার তাঁহাকে নাজেহাল করিয়াছে এবং কবি যে বাঙ্গালী, সেই পরিচয়টিও সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ইহা ছাড়া, শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'স্তবমালা' গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া যে সকল পদ রচিত হইয়াছে, সেই সকল পদও যে বাঙ্গালী কবি-সমাজেরই সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। মৈথিল বিদ্যাপতির পদসাহিত্যে সুবল, উদ্ধব, ললিতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলার নাম কোথাও নাই। শ্রীরাধিকার সূর্যপূজাও মৈথিল কবির পদে নাই। যখন এই সকল কথা বাংলা দেশের পদে পাওয়া যায়, তখন সেই পদগুলিকে এদেশেরই কবিগণের সৃষ্টি, তাহা বলিতেই হয়।

বিদ্যাপতির পদসংকলন-গ্রন্থসমূহে এই শ্রেণীর বহু পদ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীর পদগুলি যে একান্তভাবেই বাংলা দেশের সৃষ্টি অর্থাৎ এগুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়, এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া একমাত্র মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি-পদাবলী' ব্যতীত অন্য কোন সংকলন-গ্রন্থে নির্দেশিত হয় নাই। মিত্র-মজুমদার সংস্করণেই সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা বিদ্যাপতির পদ' শীর্ষকের অন্তর্গত ৩৫টি পদ স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হইয়াছে। নিম্নে এই পদগুলির প্রথম ছত্র উল্লিখিত হইল :—

১ শুন লো রাজার ঝি

২ একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়

৩ দেখলি কমল মুখী কহন না যায়
৪ নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখি
৫ কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
৬ যব সে পেখলুঁ হাম
৭ কি কহব মাধব পুনফল তোর
৮ এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
৯ মদন মদালসে শ্যাম বিভোর
১০ রাই জাগ রাই জাগ শুক সারি বলে
১১ সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম
১২ আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই
১৩ কি কহব রে সখি রজনিক বাত
১৪ এ সখি রঙ্গিনি কি কহব তোয়
১৫ কহ কহ সুন্দরি রজনী বিলাস
১৬ এ ধনি রঙ্গিনি কি কহব তোয়
১৭ কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
১৮ কি কহব হে সখি আজুক রঙ্গ
১৯ জটিলা-সাস ফুকরি তহি বোলল
২০ অবনত বয়নি ধরনী নখে লেখি
২১ ছোড়ল অভরন মুরলী বিলাস
২২ তুহুঁ যদি মাধব চাহসি নেহ
২৩ বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া
২৪ কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমনী
২৫ সজল নয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
২৬ হম অভাগিনী দোসর নহি ভেলা
২৭ নাহ দরস সুখ বিহি কৈল বাদ
২৮ যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি
২৯ দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরসন ভেল
৩০ কি করিব কোথা যাব যাব সোয়াথ না হয়
৩১ মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব
৩২ শীতল তছু অঙ্গ দেখি
৩৩ কালুক দিন হাম মথুরা সমাগম

ইহা ছাড়া, মিত্র-মজুমদার সংস্করণে আরও ১২টি পদ 'নাতি প্রামাণিক পদ—বাংলাদেশে প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ পদ' পর্যায়ে ধরা হইয়াছে। সকল পদেই বাঙ্গালী কবির পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বলা যাইতে পারে পূর্বোদ্ধৃত ৩৩টি ও ১২টি পদ [=৪৫]-ই বাংলা দেশের কবি-সমাজেরই সৃষ্টি। এই ১২টি পদের প্রথম ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

৩৪ শুনইতে ঐছন রাইক বাণী
৩৫ ধনি ধনি রমনি জনম ধনি তোর
৩৬ পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া
৩৭ হরি মথুরাপুর গেল
৩৮ সজনি কানুকে কহবি বুঝায়
৩৯ প্রেমক অঙ্কুর জাঁত আঁত ভেল
৪০ অবহু রাজপথ পুরুজন জাগি
৪১ বিরহ ব্যাকুল বকুল তরুতলে
৪২ সুন সুন মাধব নিরদয় দেহ
৪৩ চরণ নখর-মনি-রঞ্জন ছাঁদ
৪৪ খিতি রেণু গণ যদি গগনক তারা
৪৫ সুন সুন এ সখি

৩৯ সংখ্যক পদটি [প্রেমক অঙ্কুর জাঁত আঁত ভেল] গোবিন্দদাসের রচিত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে পদটিকে গোবিন্দদাসের বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন [পৃঃ ৩১০]। অতএব, এই পদটিকে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে না গ্রহণ করাই সঙ্গত। তিনি এই পদটির বিচার করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছেন,—'গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কোন্ পদ পূরণ করিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারণ করা গেল না'। সেক্ষেত্রে পদটিকে বিদ্যাপতির না ধরাই শ্রেয়ঃ। ইহা ছাড়া, উপর্যুল্লিখিত পদগুলির মধ্যে ৪৩-সংখ্যক 'চরণ নখর-মনি-রঞ্জন ছাঁদ' পদটিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিরঞ্জন প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, রসকল্পবল্লী, রসমঞ্জরী, ক্ষণদা প্রভৃতি দৃষ্টে পদটিকে নিঃসংশয়ে কবিরঞ্জনেরই বলিতে হয়। সেক্ষেত্রে এই পদটিকে বিদ্যাপতির

এই পর্যায়ের পদের মধ্যে না ধরাই শ্রেয়ঃ। যাহাই হউক, এ পর্যন্ত মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ৪৩টি পদকে আমরা বাঙ্গালী কবিগণের রচিত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদ হিসাবে ধরিতেছি। ইহা ছাড়া, আরও কয়েকটি পদ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলন গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া মোট ৭০টি পদ নির্দেশ করিয়াছেন। মিত্র-মজুমদার সংস্করণের বাহিরে তিনি যে সকল পদকে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিযা চিহ্নিত করিয়াছেন, সেই পদসমূহের প্রথম ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। উদ্ধৃত পদগুলির আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য কিনা, তাহা প্রতি ছত্রের পার্শ্বে দেখানো হইয়াছে।

১	সৈসব যৌবন দুহু মিলি গেল	প. ত. ৮২, মি.-ম. ৬১৪
২	সৈসব যৌবন দরসন ভেল	প. ত. ১০৪, মি.-ম. ৬১২
৩	কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল	ন. গু ৬, মি.-ম. ৬১৩
৪	পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ	কী. ২৩৩, মি.-ম. ৬১৭
৫	খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ	সমুদ্র ৩০, মি.-ম. ৬১০
৬	খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ	প. ত. ৮০, সা. মি. ৩, মি.-ম. ৬১১
৭	না রহে গুরুজন মাঝে	ক্ষণদা ৪, মি.-ম. ৬১৬
৮	অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর	প. ত. ১৯৩, মি.-ম. ২৩০
৯	যব গোধুলি সময় বেলি—	ক্ষণদা ৬, মি.-ম. ৩১
১০	জহাঁ জহাঁ পদযুগ ধরঈ	সমুদ্র ৩৪, মি.-ম. ৬১৯
১১	কি কহব হে সখি কানুক রূপ—	ন. গু. ৫৭, মি.-ম. ৬২৯
১২	কানু হেরব মন ছল বড সাধ	ক্ষণদা ৬৭, মি.-ম. ৬৩২
১৩	জীবন চাহি যৌবন বড রঙ্গ	প. ত. ৬৩, মি.-ম. ৬৬৫
১৪	নজানি প্রেম রস নহি রতিরঙ্গ	সমুদ্র ৪৩, মি.-ম. ৬৭০
১৫	বালা রমনা রমনে নহি মুখ	প. ত. ১৩১, মি. ম ৬৮৮
১৬	শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ	ক্ষণদা ২০, মি.-ম.—৬৬৬-খ
১৭	শুন শুন মুগধনি মঝু উপদেশ	প. ত. ১১২, মি.-ম. ৬৬৯
১৮	করে ধরি যে কিছু কহল	প. ত. ২৬০, মি.-ম. ৬৭৩

১৯ কি কহব রে সখি কহইতে লাজ — প. ত. ২৩৯, মি.-ম. ৬৯২

২০ আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর — প. ত. ১১০০, মি.-ম. ৬৯৬

২১ সখি হে কি কহব বচন না ফুর — প. ত. ১০৯৬, মি.-ম. ৬৯৮

২২ কুচজুগ চারু ধরাধর জানি — প. ত. ১০৯৯, মি.-ম. ৬৯৯

২৩ রাইক নবীন প্রেম — ন. গু. ১১৪, মি.-ম. ৭০৩

২৪ চল চল সুন্দরি হরি অভিসার — ন. গু. ২৪১, মি.-ম, ৬৩৫

২৫ চরণ নূপুর উপর সারী — নেপাল ১৭৮, পৃঃ ৮৩-খ ; মি.-ম. ৩২০

২৬ সখি হে না বোল বচন আন — প. ত. ৪৯৪, মি.-ম. ৬৪১

২৭ কত কত অনুনয় করু বরনাহ — প. ত. ৫১২, মি.-ম. ৬৪৯

২৮ শুন শুন গুণবতি রাধে — প. ত. ৯২, মি.-ম. ৬৫১

২৯ স্থন স্থন গুণবতি রাধে — প. ত. ৫৪৯, মি.-ম. ৬৪৬

৩০ হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই — প. ত. ৪৭৩, মি.-ম. ৬৫২

৩১ বড়ঈ চতুর মোর কান — প. ত. ৬৯৩, মি.-ম. ৬৫৯

৩২ দূর গেল মানিনি মান — প. ত. ৫২৪, মি.-ম. ৬৬২

৩৩ করতল কমল নয়ন ঢর নীর — রাগতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১৬ ; মি.-ম. ৪৪৩

৩৪ বিতে সরীর হোয়ে অবসান — প. ত. ৯৪৯, মি.-ম. ৬৩৪

৩৫ কি কহব রে সখি হই দুখ ওর — প. ত. ৮৩১, মি.-ম. ৬৩৩

৩৬ প্রেমক গুণ কহই সব কোই — প. ত. ৯৬৩, মি.-ম. ৬৬১

৩৭ কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি অষ্ট ২৫৬, প. ত.—৩৮৫৫, মি.-ম.—৭০৫

৩৮ ঋতুপতি রাতি রসিক বর সাজ — প ত ৯৫০৯, মি.-ম. ১১০

৩৯ নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ — প. ত. ১৪৩২, মি.-ম. ৭১২

৪০ হরি কি মথুরাপুরে গেল — প. ত. ১৬৩৮ মি.-ম. ৯৬৯

৪১ ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত — প. ত. ১৭ ৫, মি.-ম. ৭১৩

৪২ ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন — প.ত. ১৭১৩, মি.-ম. ৭১৪

৪৩ সুর তরুতল জব ছায়া ছোড়ল — ন. গু. ৬৬১, মি.-ম. ৭১৫

৪৪ হিম হিমকর কর তাপে — প. ত. ১৭১২, মি.-ম. ৭১৬

৪৫ হম ধনি তাপিনী — প. ত. ১৭৩০, মি.-ম. ৭১৮

৪৬ গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ুর রসমঞ্জরী ৩২৮, প. ত. ১৭২২ মি -ম. ৭২১

৪৭ পহিল বয়স মোর ন পুরল সাধে — প. ত. ১৭১৪, মি.-ম. ৭২২

৪৮ কালিক অবধি করি পিয়া গোল — প. ত. ১৮৬৯, মি.-ম. ৭২৩

৪৯ কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার — প. ত. ১৯৫৮, মি.-ম. ১২৫
৫০ পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা — প. ত. ১৬৪৯, মি.-ম. ১২৬
৫১ চীর চন্দন উরে হার ন দেলা — প. ত. ১৬৭০, মি.-ম. ১২৭
৫২ কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর — প. ত. ১৮৬২, মি.-ম. ১২৮
৫৩ অব মথুরাপুর মাধব গেল — প. ত. ১৬৩৯, মি.-ম. ১৩৩
৫৪ সজনি কে কহ আওব মাধাঈ — প. ত. ১৮২৭, মি.-ম. ১৩২
৫৫ কানুসে কহবি কর জোরি — ন. গু. ৭৩১, মি.-ম. ৭৩৪
৫৬ লোচন নীর তটিনি নিরমানে — প. ত. ১৬৮৩, মি.-ম. ৫৪৩
৫৭ মাধব সোঅব সুন্দরি বালা — প. ত. ১৬৮৬, মি.-ম. ৭৩৫
৫৮ হিম হিমকর পেখি — পদরত্নাকর ২৯, মি.-ম. ৭৩৬
৫৯ মাধব কত পরবোধব রাধা — প. ত. ১৮৭৭, মি.-ম. ৭৪২
৬০ চন্দন গরল সমান — ন. গু. ৭১০, মি.-ম. ৭৩৮
৬১ নদি বহ নয়নক নীর — নেপাল ৬১, মি.-ম. ৫৪২
৬২ বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরন যায় — প. ত.১ ৯৪৭, মি.-ম. ৭৪৮
৬৩ হামক মন্দিরে যব আওব কান — প. ত. ১৯৮২, মি.-ম. ৭৫২
৬৪ অঙ্গনে আওব যব রসিয়া—রসকল্প ১২৮, অষ্ট ২৬১, ক্ষণদা ৭৯, মি.-ম. ৭৫৩
৬৫ পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে — প. ত. ১৯৭৩, মি.-ম. ৭৫৪
৬৬ কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—রসমঞ্জরী, চৈতন্যচরিতামৃত
৬৭ যব হরি আওব গোকুল পুর— সমুদ্র ১৫১, মি.-ম. ৭৫৫
৬৮ দারুন বসন্ত যত দুখ দেল — প. ত. ১৯৯৭, মি.-ম. ৭৬৯

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া ৭০টি পদ নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র দুইটি পদ মিত্র-মজুমদারের নির্দেশিত। শ্রীমুখোপাধ্যায় কোন্ কারণে এগুলিকে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়াছেন, তাহা দেখান নাই। তিনি এমনই নির্বিচারে এই সকল পদকে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়াছেন যে, 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর' পদটিকেও বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত-কার মহাপ্রভুর আস্বাদিত যে কয়টি পদের ছত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই পদটি সেইগুলির অন্যতম। মহাপ্রভু যে বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতেন, তিনি আর যাহাই হউন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি নহেন,

তিনি মিথিলারই কবিসম্রাট প্রাক্-চৈতন্য বিদ্যাপতি। চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্ধৃত চারিটি ছত্র কোনক্রমেই বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ-পর্যায়ে গৃহীত হইতে পারে না। আর তাহা ছাড়া এই পদটির মাত্র চারিটি ছত্রই কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে আছে। বাকী আটটি ছত্র তিনি এই পদের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। এই অতিরিক্ত অংশ কবিরাজ গোস্বামীর উদ্ধৃতির অংশবিশেষ কিনা, তাহা শ্রীমুখোপাধ্যায় আকর নির্দেশ করিয়া প্রতিপাদিত করেন নাই। অবশ্য, তাঁহার বিপুল সংকলনের কোন পদেরই তিনি আকর নির্দেশ করেন নাই। ফলে, তাঁহার গ্রন্থ নির্ভর করিয়া সত্যের সন্ধান করা অসম্ভব।

শ্রীমুখোপাধ্যায় উপর্যুক্ত পদসমূহ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নেপাল পুঁথির 'চরণ নূপুর উপর সারি' ও 'নদীবহ নয়নক নীর' পদদ্বয় এবং লোচনের রাগতরঙ্গিণী-ধৃত বিদ্যাপতির 'করতল কমল নয়ন ঢর নীর' পদটিও বাঙ্গালীর বলিয়া নির্দেশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কোন পদেরই তিনি আকর নির্দেশ করেন নাই। তিনি এই ৬৮টি পদ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আর কিছুই নয়; যে সকল পদকে মিত্র-মজুমদার তাঁহাদের 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে 'বাংলাদেশে প্রাপ্ত রাজার নামবিহীন পদ' পর্যায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পদসমূহের অধিকাংশই গ্রহণ করিয়াছেন। মিত্র-মজুমদার যেখানে পদগুলিকে প্রামাণিক পদ-পর্যায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি বিনা বিচারে বা প্রমাণে, আপন সিদ্ধান্ত পদগুলিতে আরোপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অন্যান্য পদসমূহ সম্পর্কেও বলা যায়, তিনি যথোপযুক্তভাবে মৈথিল বিদ্যাপতির পদের সহিত মিলাইয়া পাঠ নির্ণয় না করিয়া এই পদগুলিকে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির বলিয়া নির্বিচারে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম চারিটি পদকে তিনি বাঙ্গালী কবির বলিয়াছেন। তিনি গ্রীয়ার্সন সংগ্রহের 'ভল ভেল দম্পতি সৈসব গেল' পদটির সহিত বিচার না করিয়াই এই সংযুক্তি আরোপ করিয়াছেন। ১৪-সংখ্যক পদটি [ন জানি প্রেম রস নহি রতিরঙ্গ] যে বাঙ্গালী কবির হইতে পারে না, তাহা বরাহ-

নগরের ২২-সংখ্যক পুথির সঙ্গে মিলাইয়া বিদ্যাপতির পদাবলীর বাংলা রূপান্তর অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। এই পদের পরিবর্তিত রূপ আছে। তাহাতে অ-বিদ্যাপতির রচনাও কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাপতির এমন কোন প্রাচীন পাঠ নাই যাহাতে রূপান্তর লক্ষ্য না করা যায়। সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতির না বলিয়া পুরাপুরি কোন বাঙ্গালী কবির রচনা বলিয়া এই পদটিকে স্বীকার করা যায় না। শ্রীমুখোপাধ্যায় রসকল্পবল্লী, রসমঞ্জরী, ক্ষণদা প্রভৃতি বাংলা দেশের প্রাচীন সংকলকগণের বিদ্যাপতিকে প্রায় নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। রসকল্পবল্লী, পীতাম্বর দাসের অষ্ট রস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ধৃত এবং ক্ষণদায় গৃহীত বিদ্যাপতির বিখ্যাত 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া' পদটিকেও তিনি এই পর্যায়ে আনিয়াছেন। ক্ষণদার 'কানু হেরব মন ছল বড় সাধ', 'অলখিতে হামে হেরি বিহাসকি থোর', 'ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অনুসরঈ', 'না রহে গুরুজন মাঝে' প্রভৃতি পদগুলি অ-বিদ্যাপতির এমন কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নাই। 'কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমরি', 'গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ুর' এবং 'জব হরি আওব গোকুল পুর' সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত গ্রন্থের উপর কোন আলোচনা চলে না। তাঁহার নির্দেশিত পদের পরিচয় ভ্রমাত্মক। নেপাল, রাগতরঙ্গিণীর পাঠ তাঁহার গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। সে যাহাই হউক, বর্তমানে দেখাইতে চেষ্টা করিব বাংলা দেশে প্রাপ্ত রাজার নামবিহীন পদগুলি সত্যই বিদ্যাপতির হইতে পারে কি না।

বাংলা দেশে প্রচলিত পদসমূহ বিদ্যাপতির না অ-বিদ্যাপতির, তাহা বিচারের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হইল বিদ্যাপতির ভণিতাংশ। নেপাল, রাম· ভদ্রপুরের পুথির এবং রাগতরঙ্গিণীতে ধৃত বিদ্যাপতির পদের ভণিতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার সহিত বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদসমূহের ভণিতা বিচার করিলেই ইহার যথার্থ পার্থক্য নির্ণীত হইবে। প্রথমে আমরা নেপাল পুথির ভণিতাংশের সাধারণ-স্বরূপ পরপৃষ্ঠার উদ্ধৃতি-ত্রয় হইতে দেখিতে পাইব।

১ ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনরি।
কু দিবস রহএ দিবস দুইচারি ॥

২ ভনই বিদ্যাপতি দূতী সে
হম নারী মেলি করাবএ জো ॥

৩ তীনি ভুবন মহী, অইসন দোসর নহী
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ণ
লছিমা দেবি রমাণে ॥ [১৭২]

এই উদ্ধৃতাংশ ডঃ সুভদ্র ঝা সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি গীত-সংগ্রহ' হইতে লওয়া হইয়াছে। ডঃ ঝা শুধুমাত্র নেপাল পুথিটই সম্পাদনা করিয়াছেন। রামভদ্রপুরের পুথির পাঠে যেরূপ বিদ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যায়, তাহারও নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল।

রূপনরায়ণ পহু রস জান।
রাএ সিবসিংহ লছিমা দেবী রমাণ ॥ [১]

বিদ্যাপতি ভণ বুঝ রসমন্ত।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবী কন্ত ॥ [২৮]

৩ ভণই বিদ্যাপতি অরে রে কলামতি,
ন কর মনোরথ বাধে।
অধর সুধা দএ পীতি বঢাওবি
পুরয়ো মনমথ সাধে ॥ [৭৬]

শিবনন্দন ঠাকুর সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি-বিশুদ্ধ-পদাবলী' গ্রন্থের রামভদ্রপুর পুথির পদের ভণিতাংশের সঙ্গে নেপাল পুথির ভাবগত কোনই বিরোধ নাই। ভাষাগত সামান্য পরিবর্তন প্রত্যেক পাঠের সঙ্গে প্রত্যেক পাঠেরই [তাহা যতই প্রাচীন হউক না কেন, এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি] পার্থক্য থাকে। লোচন কবির রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পাঠের ভণিতাংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

১ ভণই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
কুহু পীকট পরমাণে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমাণে॥ [পৃ: ৮৫]

২ ভণই বিদ্যাপতি মনে অনুমানি,
কামিনী রম পিআ অনুমত জানি॥ [পৃ: ১০৩]

৩ ভণই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্বে
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
সকল কলা অবলম্বে। [পৃ: ১১৫]

পণ্ডিত বলদেব মিশ্র সম্পাদিত "মৈথিল কবি লোচন-কৃত রাগতরঙ্গিণী" গ্রন্থের পদের ভণিতাংশের সহিত উপরোদ্ধৃত নেপাল ও রামভদ্রপুরের পাঠের ভাবগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু ভণিতাগত এই রূপের সঙ্গে বাংলা দেশের পাঠের মাঝে মাঝে অমিল দেখা যায়। কখনো পূর্ণ পদটি বিদ্যাপতির, কখনো বা ভণিতা বৈষ্ণব কবির। আবার কখনো পূর্ণ পদটি বাঙ্গালী কবির, কিন্তু পদটি বিদ্যাপতির বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মৈথিল বিদ্যাপতির ভণিতা যোগ করা হয়। যখন ভাবগত এবং ভাষাগত বিরোধ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন সেই পদসমূহকে আর মৈথিল কবির বলা চলে'না। বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদের ভণিতায় বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কবি-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কবি যখন সখীভাবে আপন সাধন-অনুভূতির স্বাক্ষর পদমধ্যে রাখেন, তখন তাহা যে মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা নহে, সহজেই বুঝা যায়। নিম্নের ভণিতাসমূহ হইতে এই উক্তির বলিষ্ঠ প্রমাণ মিলিবে।

১ বিদ্যাপতি কহে সুন বর কান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥ [মি.-ম. ৬১২]

২ বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয় গুণে দেয়ব আনি॥ [মি.-ম. ৬১৯]

৩ বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারি॥ [মি.-ম. ৬৩২]

কবি সখীভাবে আপন আরাধ্যের সাধনায় মগ্ন। ইহা ছাড়া, বিদ্যাপতির

২৬টি পদ 'গোরক্ষনাথ বিজয়' নাটকে পাওয়া যায়। এই নাটকের পদমধ্যে বিদ্যাপতির যেরূপ ভণিতা পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১ যুবিতিহি সঙ্গে বিসরি গেল চন্দ।
ভণই বিদ্যাপতি কোঅহ ফন্দ॥ [৯-খ]

২ রূপ সে নাগর রস সিঙ্গার।
কৌতুকে গাও কবি কণ্ঠহার॥ [৭-খ]

৩ ভণহ বিদ্যাপতি অভিনব জয়দেব জাগল পঅন গেআন।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন বুঝি বুঝাওব আন॥ [১১-ক]

৪ বিদ্যাপতি কবি গায়া।
ইধন যৌবন পানিক ছায়া॥ [১১-ক]

সখীর ও মঞ্জরীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হইতেছে নিরন্তর অনলসভাবে রাধাকৃষ্ণের মিলন-সাধনের ব্যবস্থা করা। কবি কখনও কানাইকে বলেন যে. তিনিই তাঁহার আরাধ্যের পার্শ্বে শ্রীরাধিকাকে আনিয়া দিবেন। আবার কখনও শ্রীরাধিকাকে ধৈর্য ধরিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, কবিই তাঁহাকে প্রিয়তমের পার্শ্বে মিলিত করাইবেন। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি ছিলেন না। ধর্মমতে তিনি নিঃসন্দেহে শৈব। বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদের মধ্যে চৈতন্যোত্তর ভাব-সাধনার প্রকাশ উপর্যুক্ত ভণিতাসমূহে স্পষ্ট। সেই কারণে বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদসমূহে যখনই ঐ ভাবের ভণিতা দেখা যায়, তখনই তাহা যে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণেরই সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ থাকেনা। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে ধৃত 'কেবলমাত্র বাংলা দেশে প্রচলিত রাজার নামবিহীন বিদ্যাপতির পদ' পর্যায়ে ১৫৬টি পদের মধ্যে এইভাবে ভণিতা বিচার করিয়া যে কয়টি পদকে বাংলা দেশেরই সৃষ্টি বলা যায়, সেই পদগুলির প্রথম ছত্র [মিত্র-মজুমদার সংস্করণের পদের সংখ্যাসহ] নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১ সৈসব যৌবন দরশন ভেল [৬১২]
২ সৈসব যৌবন দুহু মিলি গেল [৬১৪]
৩ পহিল বদরি কুচ পুন নব রঙ্গ [৬১৭]
৪ জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ [৬১৯]

৫	পথগতি পেখলুঁ-মো রাধা	[৬২১]
৬	গেলি কামিনী গজহু গামিনি	[৬২২]
৭	নাহি উঠল তীরে সো ধনি রাই	[৬২৫]
৮	যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরি	[৬২৭]
৯	অপরূপ রাধামাধব সঙ্গ	[৬৬২]
১০	অনেক যতন করি আনলোঁ পাস	[৬৭৭]
১১	কি পুছসি মোহে নিদান	[৭০৭]
১২	জেদিন মাধব পয়ান করল	[৭০৯]
১৩	হিম হিমকর পেখি	[৭৩৬]
১৪	মাধব ! কি কহব সো বিপরীতে	[৭৪৩]
১৫	মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা	[৭৪৫]
১৬	হামক মন্দিরে জব আওব কান	[৭৫২]
১৭	আওল গোকুলে নন্দকুমার	[৭৫৬]

বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ বলিয়া মিত্র-মজুমদারে ধৃত [৩৩+১২=] ৪৫টি পদ এবং এই ১৭টি পদ যে বাংলা দেশের কবিগণেরই রচিত, তাহা বলা যায়। বাংলা দেশের রচনাকারগণের কবিদৃষ্টি ও তাহার বৈশিষ্ট্য এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেখাইয়াছি। পরবর্তী অংশে শুধুমাত্র ভণিতা বিচার করিয়া বাঙ্গালী কবিগণের রচনার বৈশিষ্ট্য পদমধ্যে কিভাবে দেখা যায়, তাহার পরিচয়ও দিয়াছি। এই কবিদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আরও কিছু কিছু পদে পাওয়া যায়। তাহা পরে দেখাইতেছি। এই বৈশিষ্ট্য-গুলির স্বতন্ত্র প্রয়োগ এবং পদমধ্যে তাহার পরিচয় আলোচ্য অংশে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে।

দুই

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব যখন স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তখন সেই পদের উপর সন্দেহ সহজেই জন্মে এবং এই সন্দেহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তখনই ইচ্ছা হয়, যখন শ্রীচৈতন্যের ভাব এবং ভাবনা সেই পদের প্রধান বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। এই শ্রেণীর একটি অপ্রকাশিত পদ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

কাফি রাগ

সায়রে মরিব সখি করিয়া কুণ্ডলী।
কানুরে কহিয় যেন দেন তিলাঞ্জলী॥
সোই আপন কান হোয়ক যব রাধা।
তবয়া জানব বিরহক বাধা॥
শ্যাম তেজিয়া গৌর যব হোয় কান।
গৌর শ্যাম যব হো এক ভাণ॥
বিরহক যত দুখ জানব কাজ।
যত দুখ এ সুখ হৃদয়ক মাঝ॥
লছিমাক দুঃখ নৃপতি কি জান।
বিদ্যাপতি কবি দুখ পরমান॥ (বরাহ ২২ ; পদ ১১০, পত্র ১৩-ক)

শ্রীচৈতন্যের নাম ও ভাব কবি আশ্রয় করিয়াছেন এবং তাহা প্রায় প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি আর যাহাই হউন, এই ভাবের ভাবুক তিনি নহেন। চৈতন্য-পরবর্তী কালের ভক্ত-কবির হৃদয় এখানে উচ্ছ্বসিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবনারই প্রতিচ্ছবি নিম্নোদ্ধৃত অপ্রকাশিত পদটিতেও পাওয়া যায়।

আশাবরী

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাসি বধুকর কোর॥
নয়ন ঢুলু ঢুলু লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী রাই রসিকবর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোহার বয়ানে বয়ান॥
দুহু তনু মাতল দুহু শর হান।
বিদ্যাপতি কর সো রস পান॥

মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদসমূহে ব্রজকিশোরী বা বৃষভানু নন্দিনী ভাষাগতভাবে অপ্রত্যক্ষ রহিয়া গিয়াছেন। ইহা যে বাঙ্গালী কবিরই নিজস্ব প্রয়োগ তাহা বলা চলে। আরও একটি অপ্রকাশিত

পদে ব্রজকিশোরী বা বৃষভানুনন্দিনীর বিরহ-বেদনার চিত্র নিম্নরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

বালা

বৃষভানু কিশোরী অতি খিনা।
নয়নক বারি ঝর ঝর বরিখয়ে
তুয়া বিনু আকুল দীনা॥
জানু যুগ সাথে নখে লিখি বুঝত
নিশি দিশি গণিঞা।
কোই কোই ধনি তুয়া নাম নিতে
চমকি চমকি উঠে শুনিঞা॥
পন্থ ঘন হেরত তোহে নাহি দেখত
লোচনক কাজল গেলা।
ঝর ঝর বারি ধরাধর গীরত*
কঞ্চুক লোরে ভিহি গেলা॥
তো পরশ বিনু কো তনু রাখব
বণিক হেম বিচারি।
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ নরপতি
তো বিনে কৈছে জীয়ব সো নারি॥

(বরাহ ২২; পদ ১১৮, পত্র ১৪-ক)

* অর্থাৎ, কুচযুগরূপ ধরাধরের উপর নয়নজল অবিরত পড়িতেছে।

শব্দ-চয়নে এবং অলঙ্কার-প্রয়োগে কবি বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। এই পদটিতে কবির সেই স্বভাবজ চাতুর্যের কোন পরিচয়ই নাই। সর্বত্র ছন্দের মিল নাই, আবার চরণের মিলের ক্ষেত্রেও কবির দীনতা বড় স্পষ্ট। 'বৃষভানু কিশোরী' মৈথিল কবির পদে অলিখিত। পদটিকে বাঙ্গালী কবির রচনা বলিতে কোন দ্বিধা নাই।

বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কিছু পদে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের প্রভাব অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। এই পদগুলি যে বাংলা দেশেরই কবির রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। পরপৃষ্ঠার অপ্রকাশিত

পদটি এই সিদ্ধান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্রীরাধিকাকে মান শিক্ষা দিতেছেন তাঁহার সখিগণ।

সুন্দরী কানু পিরিতি করু রোখ।
নিকটে আনি কহবি বাণী
কিএ গুণ কিএ দোখ॥ ধ্রু॥
অপরাধ জানি দোষ না দেয়বি
প্রেম টুটি কাহে লাগি।
প্রেম টুটাইতে যো উপদেশব
তাকর মুখে দেই আগি॥
কহইতে বাত তুহুঁ নাহিক
হরি অধিক না করবি মানে।
বিনি মানে হরি বশ না হোয়
বিদ্যাপতি কবি ভানে॥

(বরাহ ২২ : পদ ৩০, পৃঃ ৫-ক)

বামার বাম্যতা প্রীতিকর—শ্রীরূপ ভাবনার অনুসারী কবি এই পদটি রচনা করিয়াছেন। মিলন-আনন্দের বর্ণনায় বাঙ্গালী কবি একই ভাবে আপন ভাবনার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন।

বালা

এতদিনে সো বিহি ভেল অনুকুল।
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভেল আকুল॥
যবহু স্মিত নব দরশনে মেটহুঁ রে।
দুহুঁ পুন কান্দল লহু লহু রে॥
বাহু পসারি দুহেঁ দুহুঁধি ঝরে।
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ মুখ ভরু রে॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদন রুচরে।
কি কি করি কিঙ্কিণী উঠরে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস ভনুরে।
নরসিংহ লছিমা ইহ রস শুনরে॥ (বরাহ ২২ : পদ ৫৪, পত্র ৭)

পদটি যে বাঙ্গালী কবির, তাহা একটি বলিষ্ঠ পদমধ্যে পাওয়া যায়। কবি পদটিকে বিদ্যাপতির নাম-তরণীতে তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে শান্তি

থাকিলেও স্বস্তি নাই। সেইজন্য নরসিংহ ও লছিমার নামোল্লেখ করিয়া স্বস্তি পাইতে চাহিয়াছেন। মিথিলার অন্যতম রাজা ছিলেন নরসিংহ এবং তাঁহার রানী ছিলেন ধীরমতি। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পক্ষে এইরূপ ভণিতা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। এই দিক হইতে এবং ভাবের দিক হইতে বিচার করিলে এটিকে বাঙ্গালী কবির রচনা না বলিয়া উপায় থাকে না। ভণিতাগত অসাম্য নিম্নোদ্ধৃত অপ্রকাশিত পদটিতেও সহজলভ্য।

ভুপালা

যব হরি উন্নত কুচযুগ বহই।
তব যুবতী জনে আদর করই॥
যৌবন বিনু পেসব ধন্দা।
রজনিক কমল দিবসে জনু চন্দা॥
মানিনী মোহে মান করবি।
ইহ উপদেশ দৃঢ় করি ধরবি॥
মদনক জাতি জনু দুরবারা।
অপজস গেলহুঁ কৈছে উপকারা॥
আপন মনে তুহুঁ বুঝ বিচারি।
যৌবন জীবন দিন দুই চারি॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ গুণ জান।
রায় নরসিংহ লছিম পরাণ॥

(বরাহ ২২ : পদ ৩৪, পত্র ৫-ক)

প্রেম-বৈচিত্র্যের একটি অপ্রকাশিত পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই পদটি যে চৈতন্য-পরবর্তী কালের, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই পদে শ্রীরূপের ভাবানুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত প্রেম-বৈচিত্র্যের লক্ষণ ইহার সর্বত্র প্রস্ফুট।

রাই রাই করি ফুকরই কান।
কো রহি রহিধনি করু সাবধান॥
কানুক বদনে বদন করি থির।
কতহুঁ নয়নে বহু ঝরতহি নীর॥

পীন পয়োধর ধরত হৃদি মাঝ।
কণ্টক জানি নয়নে বহু লাজ॥
সঘনে আলিঙ্গই বাহু পসারি।
কমলিনী জানি দূরহি দূর ভারি॥
নাসা পূরল ধনি তনু······।
মলয়জ সৌরভ করত অনুবন্ধ॥
নয়নহি হেরল কাঞ্চন গোর।
হেমলতা বলি না করয়ে কোর॥
ঘন অনুতাপই কহই মাধাই।
কবে মুঝে মিলব রসবতী রাই॥
বিদ্যাপতি কাহে কিয়ে ইহ রঙ্গ।
মধুকর বিলপহুঁ কমলিনী সঙ্গ॥ (ক. বি. ৬২০৪ ; পদ ৯৪২)

সখীভাব বা মঞ্জরীভাবের পদ চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবির রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা চৈতন্যোত্তর কালের রচনা নিশ্চিত।

কেদার

হরি গলে লাগল চম্পক মালা।
পুলকিত বাহু বিহসি রহু বালা॥
কানু রহল মুখ কমলে লাগাই।
লাজে কমলমুখী রহু পালটাই॥
হেরি হেরি নখ দেই গেঁড়ুয়া বিদার।
ধনি কুচযুগ চাপি ভেল সীৎকার॥
রতিরণ রঙ্গহি পুলকিত ভেল।
বিদ্যাপতি তব দরশন কেল॥ (বরাহ ২২ : পদ ৬৭, পত্র ৮)

শৃঙ্গার-বিষয়ক পদটির শেষ ছত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বিদ্যাপতি তব দরশন কেল'—কবি এখানে মঞ্জরীভাবের সাধনা করিয়া লীলা দর্শনে ব্যস্ত। এরূপ বর্ণনা মৈথিল বিদ্যাপতির কোন পদেই নাই। এই পর্যায়ের আরও একটি অপ্রকাশিত পদ উদ্ধৃত হইল।

রামকেলী

ভালে মাধব রাই একঠাম।
তুয়া দুই চরণে দূতী পরণাম॥
সাধন কাজ কপট করি নারী।
দূতিক গৌরব দিন দুই চারি॥
দগধে আঙ্গার সোহাগে কক কোর।
ঐছন ভাতি বিহি কয়ল মোর॥
বিদ্যাপতি ভণ রস অভিলাষ।
সুর দেবী গণক পুরল আশ॥ (বরাহ ২২: পদ ৭১, পত্র ৯-ক)

রামানন্দ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' ইত্যাদি পদের 'না খোজলু দূতী, না খোজলু আন। দুই কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ'॥ পদের প্রভাবেই ইহা লিখিত

যুগলমিলনের পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত অপ্রকাশিত পদটিতে কবি সখীভাবে ভাবিত হইয়া এই পদটি রচনা করিয়াছেন।

দেখ সহি দুহেঁ দুহুঁ মীলল ভেলা।
দারুণ বিরহ সবহুঁ দূরে গেলা॥ ধ্রু॥
করে ধরি গজ কোরে সোঁপলু রামা।
দুহুঁ অঙ্গে মণিময় তড়িত দামা॥
দুহেঁ দুহুঁ আলিঙ্গন বাহু পসারি।
গলে গল চুম্বন অঙ্গ নেহারি॥
কত শত অমিয়া দুহুঁক অধরে।
পহুঁক সোহাগে রাই রস উগরে॥
নিভৃত নিকুঞ্জ কুসুমক বন।
কুমুদ আমোদ বহে মন্দ পবন॥
বিদ্যাপতি কহ নাগরি তোর।
ভুবন পতি ভেল নাগরি চোর॥
(বরাহ ২২: পদ ৫২, পত্র ৭-ক)

যিনি ভুবনপতি তিনি আজ নাগরী-চোর হইলেন। বিদ্যাপতিও সেখানে অবহেলিত থাকেন নাই। সখীর ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করিয়া এই মিলন-বর্ণনায় কবি আপনার স্থানটি স্থির করিয়া লইয়াছেন।

মিলনের রূপ-বর্ণনায় বাঙ্গালী কবিচিত্ত মুখর হইয়াছে। অনুরূপ ভাবের আরও একটি অপ্রকাশিত পদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

গান্ধার

ধনি মুখ বিলসে নাহিক ওর।
ধনি ধনি রঙ্গিনী নাগর চোর॥
ভুলল কানু ধরি রাই।
হরি বিলসে কত রস অবগাই॥
হরি তোরে তুহুঁ সুন্দরী সুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বন মুখে॥
ভজ ভজ সুন্দরি সুন্দর কান।
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস ভান॥ (বরাহ ২২ : পদ ৯৪, পত্র ১১)

কবি এখানে সখীভাবে ভজনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বাঙ্গালী কবি-হৃদয় শ্রীরাধিকাকে নানা ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মৈথিল কবির নৈপুণ্য অসাধারণ সন্দেহ নাই। তথাপি মৈথিল বিদ্যাপতি যে অভিসার বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রীরাধিকার হৃদয়কে সহস্রদল কমলের ন্যায় নব নব রূপে গোবিন্দদাসের মতো মেলিয়া ধরিতে পারেন নাই, তাহা অনস্বীকার্য। নিম্নে বিদ্যাপতির ভণিতায় তিনটি অপ্রকাশিত পদ উদ্ধৃত হইল। এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত এই পদসমূহ, বাংলা দেশেরই কবির রচনা। গোবিন্দদাসের অভিসার বর্ণনার পদচিহ্ন এখানে সুস্পষ্ট। এমনকি সেই ছত্রগুলিই যেন বেশ পরিবর্তন করিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। মৈথিল বিদ্যাপতির বর্ষাভিসার-বর্ণনার সূত্র ধরিয়াই গোবিন্দদাসের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই পদগুলি রচিত হইয়াছে। মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থের ১০৩, ১০৪, ১০৭, ১০৮ প্রভৃতি পদসমূহ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১

শ্রীরাগ

এ হরি জানি করহ মোহে রোখ।
আজু কেরি বিলম্ব দৈবকি দোখ॥ ধ্রু॥

তেজি নিজ মন্দির পদ দুয় চারি।
অনমেহ বরিখএ মহী ভরি বারি ॥
একগুণ তিমির লাখ গুণ ভেল।
দিগ বিদিগ ভাল বহি গেল ॥
পথ পিছুরই অতি গুরু নিতম্ব।
খসে কত বেরি না কছু অবলম্ব ॥
খনে দরশায়ই বিজুরিক রেহ।
উঠয়ে গেহিয়ে জলধারক থেহ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
ধনিকে দেখিবি হৃদয় বিচারি ॥

(পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি : পদ ১১৬, পত্র ৪০)

২

মন্দির ছোড়ি পহিল পদ আরোপিতে
বাজ পড়ল দুয় পাশে।
জীবনক সঙ্কট কহই না পারিয়ে
প্রেমক ভঙ্গ তরাসে ॥
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাই।
যত দুখে কামিনী আনলহুঁ যামিনী
লাখ মুখে কহই না জাই ॥ ধ্রু ॥
উগরল ফণি মণি দীপশিখা জনি
নিভইতে দিল ফুৎকারে।
পরলোকে লোভে ভুজঙ্গম ধাওল
পুণ্য পায়ল প্রতিকারে ॥
ঘন আঁধিয়ার দূতর পাঁতর
ইথে হু গমন হোয়ে ধার।
বিদ্যাপতি বাণী শুন শুন গুণমণি
দূতীরে করহ পরসাদ ॥

(পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি : পদ ১১৮, পত্র ৪৫)

৩

চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জবর গমণী।
নয়ন সরোরুহ বিধুবর বয়ণী॥
গগন সঘন মহিপঙ্কা।
তাহে উঠতহি ঘন পঙ্কা॥
ভীম ভুজঙ্গম শরণা।
বাট কণ্টক কোমল চরণা॥
কবি বিদ্যাপতি কহই।
প্রেমক লুধব পবাড়ব সহই॥
(পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি : পদ ১২২, পত্র ৪৭)

মৈথিল বিদ্যাপতির পদে প্রাকৃত নায়িকার বিচিত্র অনুভূতির অপরূপ স্বাক্ষর সহজলভ্য। বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের পার্থক্য সেই একই ভূমিতে। কবি গোবিন্দদাস প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহার নায়িকা শ্রীমতী রাধিকাকে উপস্থিত করিয়াছেন। অলঙ্কারের অপরূপ শ্রী তাঁহার সর্ব অঙ্গে। এই ভাবানুভূতি এবং ঐশ্বর্যের সাধক গোবিন্দদাস তাঁহার কবিধর্মকে ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করিতে দেন নাই। বিদ্যাপতির নিকট, ধর্মীয় আদর্শ কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করিয়া দেয় নাই। ফলে, তিনি জীবন-সঞ্চারী। তাঁহার নায়িকা জীবনের ভূমিতে অস্থিরা, চঞ্চলা। আলোচ্য পদসমূহে শ্রীরাধিকা বিদ্যাপতির পথ ধরিয়া অভিসারযাত্রাতে 'গুরু নিতম্ব' সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু পরক্ষণেই বলেন যে, এই রাই একান্তভাবেই 'কানু অনুরাগিনী' এবং এই যামিনী এত দুঃখ দিল যে, তাহা 'লাখ মুখে কহই না জাই।' চৈতন্যোত্তর কালের কবি, বিদ্যাপতির ভণিতায় শ্রীরাধিকার যে রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব ভক্ত-হৃদয়ের নিত্যবন্দিত রসরূপ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভক্তকবি তাঁহার মন-সমুদ্রে যে 'শ্যামর কেলি' নিয়ত দর্শন করিয়াছেন, তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত অপ্রকাশিত পদটিতে।

সাওত মল্লার (কাণড়া)

উভেকর নিশানী রঙণীমণি।
জনু যুহলে গজরাজ গওনী ধণী॥

কনঠহি মোতি মনোহর পুঞ্জা।
অলক কপোল ভঙর মদ গুঞ্জা॥
আঁচর চঙর ধজা কহ বাঞ্চি।
চলত গজেন্দ্র অলটা বাঞ্চি॥
আঙ্কুশ কোঁচ মানত নাহি ফেরে।
সহী অনভবে চলত সব ঘেরে॥
তবহি দুখিণী অল বেলী।
মনহু সমুদ্রে শ্যামর কেলি॥
বিদ্যাপতি কবি গাহই।
মদন মাহুত দেই বহু থাই॥
(পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি : পদ ১২৩, পত্র ৪৭)

অভিসারের এই নব রূপ নিতান্তই ভক্ত কবি-হৃদয়ের নবভাব-তরঙ্গের অপরূপ প্রতিচ্ছবি। কবি দেহের আরাধনা করিতে করিতে দেহকে মন্দিরে রূপান্তরিত করিয়া আপন হৃদর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন। মৈথিল কবির ভোগরাগের আরতি এখানে ভক্ত হৃদয়ের অনির্বাণ দীপশিখায় আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিদ্যাপতির ভণিতায় কবি আপনার ব্যক্তি-পরিচয়টি লুপ্ত করিলেও, তাঁহার হৃদয়টিকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিতে পারেন নাই।

হিন্দি-বাংলা মিশ্র ভাষার পদ

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতির ভণিতায় কোন একজন কবি পদ রচনা করিয়াছেন তাহা নয়, বহু কবিই বিদ্যাপতি ভণিতায় আপন কবিকর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে, বিদ্যাপতি ভণিতার পদের নানারূপ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। নিম্নোদ্ধৃত অপ্রকাশিত পদটির সম্পর্কেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এখানে কবি ভাবিয়াছেন, বিদ্যাপতি হিন্দিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই কবিও হিন্দিতে পদ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বিড়ম্বিত করিয়াছেন।

প্রথমাবস্থা দেহ হামারা নাহি জানে রস কো ভেদ।
যব পিয়া পরদেশী প্রেয়া তব প্রেমপুর অবিচ্ছেদ॥ ১

দোষ গুণ কছু না বুঝিয়ে নাহি প্রেমক লেশ।
প্রথমাবস্থা দশা হামারা পিয়া ভেও পরদেশ ॥
অব তরুণী ভেও পিয়া হামারি পরবাস।
ক্যা সাধ জিউ নামেরা পিয়া নাহি মোর পাশ ॥ ২
হাম সারি কায়ো কই হোগা মনমে বুঝায় কাম।
বিরহিনীর বিরহ লেকে জায় পিয়া কো ঠাম ॥ ৩
বিরহ বেদন যে জন জানে বিরহিণী জানে সোই।
প্রিতম সোভ্রিত জানে প্রীত বিহনমে রোই ॥ ৪
যাও সহচরি প্রিতম পাশ যাঁহা প্রিতম পাও।
প্রেম বিহনমে প্রাণ জায় প্রিতম আনি দাও ॥ ৫
পহি স্নহে হেঁ কী পাখা মিলে প্রীতম সে উড়ি যায়।
যাঁহা প্রীতম বৈঠে তাহা পঙ্খ পঙ্খ মিলায় ॥ ৬
পরিহরি গেল মোরে ছাড়ি কোন অপরাধ দেখি।
অবোধ পরাণে ধৈরজনা মানে শুন শুন প্রাণ সখি ॥ ৭
প্রাণের ললিতা শুন তুমি কথা আমার বচন রাখ।
পিয়া পরদেশে নিজ গৃহ বাসে অনুসারে তাঁরে ডাক ॥ ৮
পরাধীন নারী মিছা মনে করি ফুকর‍্যা কহিতে ভয়।
শাশুড়ী ননদী তারা হল্য বাদী কত মতে কত কয় ॥ ৯
আপনার মন করে উচাটন দিবানিশি মন কান্দে।
বিদ্যাপতি কবি লছিমারে সেবি পড়িলী আপন ধন্দে ॥ ১০

(ক. বি. ৩২৮, পত্র ৯)

বিদ্যাপতিকে হিন্দি কবি মনে করিয়া পদকর্তা হিন্দিতে পদ রচনা করিতে গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ব্যর্থতাই সার হইয়াছে। নিম্নরেখ অংশগুলিই তাহার প্রমাণ। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া শেষ ছয়টি ছত্র পুরাপুরি বাংলাতেই রচনা করিয়াছেন। এমন কি পদমধ্যে ললিতার উল্লেখও কবি না করিয়া পারেন নাই। কবি যে শ্রীরূপের পরবর্তী কালীন কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৮-সংখ্যক পুথির পরবর্তী কয়েকটি পদও প্রসঙ্গত আলোচনার যোগ্য। এই পদের পরবর্তী পদসমূহ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

পরদেশী ভক্তিপিয়া ছোড়ি প্রীতকো আশ।
কহ না কো বাত নাহি হামার জীউ ভেও উদাস॥ ১
ক্যা করিয়ে অবলা হেঁ পর অধীন সে রহিঅ।
ধিকর হিয়ে পরাধীন কো ভৎর্সনা কত সহিএ॥ ২
ক্যা কহিয়ে কহনা নাহি কুটিল কো সাঁথ বাত।
এ সে প্রীত কিজিয়ে না হোহঁ কুটিল কো সাথ॥ ৩
প্রীতকিয়ে দূরদেশ গেও নাহি জানে আপনাকো ঠোর।
অবলা মরে সেঁ ক্যা হোগা জীউ কা নাহি ওর॥ ৪
ঘর সে ঘর ভেদী ভেও মন মে নাহি মিলায়।
কুটিল কো ভেদ কুটিল সোঁ কুটিল কো প্রাণ যায়॥ ৫
কুটিল কো ভেদ কোকিল হেঁ কোকিল ভেদ স্বরগান।
স্বরভেদ হেম হোয় হেম ভেদ প্রেম নাম॥ ৬

স্বুত্যোক্তি:

শুন হে কুটিল তুমি বড় খল
তোমার কুলিশ হিয়া।
পিরিতি করিঞা ছাড়িঞা আইলে
আলায়ে শেল দিয়া॥
সে সব অবলা না জানএ জালা
পিরিতি বলিয়া কথা।
পিরিতি কেমন না জানে কখন
শুনিলে মরমে বেথা॥
তুমি নিরদয় মিছা পরিচয়
তোমার কঠিন নেহা।
কি করিয়া আল্যে অবলা বধিলে
মজাল্য সকলে দেহা॥
তারা পরাধীন পরের অধীন
তাহাতে পরের বশ।
তোমার লাগিয়া সকল মজাল্য
কুলে শীলে অপযশ॥

দূতির বচন শুনিয়া তখন
কাতরে নাগর বলে।
বিদ্যাপতি কহে শুন নিরদয়
অবলা ভাসিল জলে ॥ ৩

অথ দোহা

দূতী কহে শুন নিরদয় নিকপট কঠিন প্রেম।
অবলা সেঁ৷ আগে ডাকো শেষে ক্যা করে হেম ॥ ১
যাঁহা কোকিল গান করে যাঁহা প্রীতমকো বাস।
সোই গানমে প্রাণ দহে প্রীতমকো পাশ ॥ ২
শুন সুমাধব অবলা পেখলু মতি হীনা।
সারেঙ্গ শবদে মদনে শোকাপিত তা দিন দিনা ভেল ছিনা ॥
রহবি বিদেশে সন্দেশ না পাঠায়ত কৈছে জীয়বি ব্রজবালা।
ঐছন পিরিত কি রীত কবি জানলু জারল বিরহ কি জ্বালা ॥
তুহুঁ গুণ ঘোষহুঁ তুহুঁ গুণ রোয়ই দিবা নিশি ঝুরতহিঁ নাম।
তুয়া গুণ গনইতে গুণ গণ গানইঁ ঝুরত অবোধ নয়ান ॥
তুহুঁ বড় জঠিন কপাট কলেবর কুলবতী কুল দূরে গেল।
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব আলা হৃদয়ে রহে শেল ॥ ৪

উপর্যুক্ত তিনটি পদের ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। সঙ্গে সঙ্গে এই পদ-সমূহের রচনাকার হিন্দি পদ রচনা করিয়া তৃপ্তি পান নাই, সেইজন্য বাংলায় আপন মনের মরম কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষের পদটিতে বিদ্যাপতির পদের ভাব-ভাষার অনুসরণ করিয়াছেন, বিশেষভাবে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ছত্রদ্বয়ে। মৈথিল বিদ্যাপতি 'সারঙ্গ' শব্দটি নানাভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত 'মাধব কি কহব সুন্দরীরূপে' [মি.-ম—২৫] পদটিতে এই শব্দের ব্যবহার নিম্নরূপে পাওয়া যায় ঃ—

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমাধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দস সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে ॥

এখানে, সারঙ্গ নয়ন = হরিণের মতো চক্ষু, বচন পুন সারঙ্গ = গলার স্বর কোকিলের ন্যায়, সারঙ্গ তসু সমাধানে = মদন তাহার কটাক্ষে, সারঙ্গ

উপর=কমলতুল্য মুখের উপর, উগল দস সারঙ্গ=ভ্রমরের ন্যায় দশটি চূর্ণকুন্তল উদিত হইয়া মধুপান নিমিত্ত ক্রীড়া করিতেছে। 'সারঙ্গ' শব্দের যে প্রয়োগ উপর্যুক্ত অপ্রকাশিত পদটিতে হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পদ-কল্পতরুর ১৮৯১-সংখ্যক পদের প্রথমাংশের সাদৃশ্য অত্যধিক।

মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা।
সারঙ্গ-সবদে মদন অধিকায়ল
তাহে দিনে দিনে ভেল খীনা॥

এই পদটি পদামৃতসমুদ্রে [পৃঃ ১৬৪], সারদাচরণ মিত্রের সংগ্রহে [১১১], নগেন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহে [৭৪৪] এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭৯৮ পুথিতে [১১৪ পত্র] ও ২৩৮৩ পুথিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির প্রথম ছত্র—'অবলা পেখলুঁ মতিহীনা।' মিত্র-মজুমদারে এই পদটি ৭৪৫-সংখ্যক। অপ্রকাশিত পদটিতে 'কোকিলের' উল্লেখ আছে। 'কোকিলের' উল্লেখ বিদ্যাপতির পদে অপ্রাপ্য নয় [মি.-ম. ৭৩৬]। বিদ্যাপতির ভাব এবং ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই কবি এই পদ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা যে মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা নয় তাহাও অনস্বীকার্য। এই পদটির শেষাংশের সহিত পূর্বোল্লিখিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৩-সংখ্যক পদের শেষাংশের সহিতও ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—

ঝর ঝর নয়ন শ্বাস বহে দরদর
মোতিম তাঁহি ভেল দূর।
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব
অব তুয়া মনোরথ পুর॥

বিদ্যাপতির প্রভাব সর্বত্র, কিন্তু হিন্দি এবং বাংলায় মিশ্রিত পদসমূহকে বিদ্যাপতির ভণিতায় যুক্ত করিলেও, এই শ্রেণীর পদগুলি যে বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদ-পর্যায়ে পড়ে না, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এই পর্যায়ের আরও একটি অপ্রকাশিত পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিহাগড়া

উধো কুশল কহো কি কেঁহোএ ব্রজনাথ।
উনকে দরশন বিনু ভাঙো হেঁ অনাথ॥

গৃহ মেরা বন ভয়ো কছু নাহেঁ সো হায়।
চলগি উঠত মন তুলহি ন সভায় ॥
সোঅরি সে সব সুখ ঘট না রহ প্রাণ।
পর কি বেদন কোই নাহি জান ॥
ভনহুঁ বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সরবশ নইগয়ো মোহন মুরারী ॥ (ক. বি. ৩৩১, পত্র ১৮)

উদ্ধব-সংবাদ বাঙ্গালী কবির পরিচিত এবং প্রিয় আশ্রয়ভূমি। হিন্দি সাহিত্যেও উদ্ধব-সংবাদের প্রচলন আছে; বিশেষ করিয়া সুরদাসের রচনায় উদ্ধব বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছেন। এই পথ ধরিয়াই কবি উদ্ধবের নিকট কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কোন পদেই উদ্ধবের উল্লেখ নাই। পদটি যে অকৃত্রিম নয়, তাহা অনস্বীকার্য।

উদ্ধব-সংবাদ যে বাঙ্গালী কবিরই রচনা, তাহা নিম্নের অপ্রকাশিত পদটি হইতে সহজেই বুঝা যায়। এখানে কবি কখনো সোজাসুজি বাংলাতেই আপন কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার কখনো মৈথিল কবির প্রহেলিকা পদের অনুসরণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ-ভাবনার অপ্রত্যক্ষ প্রভাবও যে না দেখা গিয়াছে তাহা নয়।

শুন হে উদ্ধব সাধিব কি।
বিধাতা করেছে কুলের ঝি ॥
তিনের লাগিয়া হারাইলাম সাত।
তবু না পাইলাম পরাণ নাথ ॥
রাম রক্ত বিধু বদন যায়।
হেরিতে না পারি তনয় তার ॥
অসুর আরতি বাহন তুণ্ড।
তাহার অনুজ বাহন কণ্ঠ ॥
দেখিলে নখিসে দুখের ঘর।
হৃদয়ে লাগয়ে মদন শর ॥
তিন দশ তিন হরিঞে তার।
এতেক ভাবিনি ভুবনে যার ॥

তাহারে দেখিনে ফাটয়ে বুক।
হৃদয়ে জাগয়ে প্রিয়াক মুখ ॥
অদিতি নন্দন তাহার সুতা।
তাহার নিকটে গগন ক্ষতা ॥
সেখানে এখন যাইতে নারি।
কাক রিপু রবে পরাণে মরি ॥
দক্ষসুতা সুত বাহন ভক্ষ সুতে।
তাহার বদন বিকৃতি যাতে ॥
প্রবেশ করিয়ে মরিব তায়।
কবি বিদ্যাপতি ধরিছে পায় ॥ (ক. বি. ৬২০৪, পদ ১৯১৯)

উদ্ধবের নিকট প্রহেলিকাময় এই নিবেদন কবি-কৃতিত্বের যে স্বাক্ষর বহন করিয়া আনে, তাহা আর যাহাই হউক, মৈথিল কবির সঙ্গে মিলে না। উদ্ধবকে সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যাপতির ভণিতায় কবি যেমন পদ রচনা করিয়াছেন, তেমনি কৃষ্ণ-সখা সুবলকে লইয়াও যে পদ রচনা করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবে মৈথিল কবির কোন পদে এইরূপ পরিচয় নাই।

সুহিণী

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী বিলাস কাম ॥
সে যে সুবদনী[১] সুন্দরী রাই।
আর সে হিয়ার[২] মাঝারে নাই ॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহিসি মন্দ মন্দ ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই[৩]।
সে সব স্বপন হোয়ল মোয়[৪] ॥
কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দীঠ ॥
ধনি হিয়ায় মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহ নবীন রাগে[৫] ॥ (ক. বি. ৬২০৪, পদ ২৬২৭)

পাঁচথুপীর পাঠান্তর : ১ বিনোদিনী। ২ আবেশে হিয়ার। ৩ করল সোই। ৪ সোই (>সই)। ৫ কহ নব অনুরাগে।

বিদ্যাপতির ভণিতায় বাঙ্গালী কবি শ্রীরাধিকার বারমাসের দুঃখ-গাথাও বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩১-সংখ্যক পুথিতে যে বারমাসিয়াটি পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই অপ্রকাশিত পদটিতে বাঙ্গালী কবিচিত্তের স্পর্শ সর্বত্র।

অথ বারমাসিয়া শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরস্য :

রাগ মল্লার

মাঘ আঘন নহে মধুর
গমন পরথনে ভেলিয়া।
ব্রজপুর নারী পুরুষ রোয়ত
পশুপাখি শাখিয়া॥
শুন ভেল ঘর নগর চাতর
তিমির দশদিশ হেরিয়া।
সে গিরি কন্দর কুঞ্জ মন্দির
হেরি দহ দহ দেহিয়া॥
গুণক আগর নগর সরবশ
রসিক পিয়া সঙ্গ দেইয়া।
মুগধ বিধি নিধি দেই লেওল
তবহিঁ করসঞে কাটিয়া॥
সজনি নিদারুন দুখ বিহি দেল।
দুঃসহ দুখভরে কনয়া কলেবর
কাঁতি কালিম ভেল॥ ধ্রু॥
পৌষ মাসে পিয়া রহল পরদেশে
পোহায়ে নাহি পাপ রাতিয়া।
সোঙরি সে সব শ্যাম গুণ গুণ নিঝরে
ঝরু দুনয়ঁাখিয়া॥

হিম হিমাচল অরুণ নীল আনল
তাপে তাপই দেতিয়া।
নাহ বিমু বিপরীতরিত ভেল
কণ্ডন হই পাতিয়াইয়া ॥
কান্ত কামিনী নগর বাসিনী
কোরে রহু রস ভরিয়া।
হাম বনচরী নারী নিরগুণ জানি
রহলুঁ বিছুরিয়া ॥
সজনি মাহ হই রহি জাঁয়া।
অবধি চিতে কত দেওব পরবোধ
নাহি মান পাপিয়া ॥ ধ্রু ॥
মাঘে হিমকর করহিঁ শীতল
দহন দহ দিঘ রাতিয়া।
সেজ সুখময় ভেজি ভূতল
সুতি ছটফট দেহিয়া ॥
পিয়াকে আওল অবধি উঠি বসি
গনিয়ে ভীত করেথিয়া।
পূরল দিন নাহি নাহ আওল
পুছিয়ে পন্থি রোলাইয়া ॥
কংস নিসূদন সহজে নিকরুণ
চরিত জমু নবরঙ্গিয়া।
ভূতল ভাবিনী ভার তারণ
রঙ্গ রস পর সঙ্গিয়া ॥
বিছুরি চাহিয়ে খেণে নাহি ছোট
যে চিত তুহ চীত চোরিয়া।
ফাগুণ ভেল নাহি আগুন বহল
মধুপুর ভোরিয়া ॥
পূরল মনোরথ সো পুর বাসিনী
পুলক ফলে পিয় দাহিতা।
খেলত হোলি শ্যাম সুভগ অঙ্গ ভরু
অরুণ আবীর তারিয়া ॥

যন্ত্র ভরি নব কুসুমে সিঞ্চই
অনঙ্গ রঙ্গ দিল বাড়িয়া।
হাম পিয়া বিনু ধূলি ধূসরি
লোরে সিঞ্চই দেহিয়া॥
কাম কৌতুকে কতহি ভাবই
বিষম খর শর পতিয়া॥
সজনি মাহ ইহ কৈছে আর।
জীবন যৌবন বহত পুন কিয়ে
নাহি নিকরুণ আর॥
মধুরস মধুমাসে কান্ত পরদেশে
রাজ রিতু পরবেশিয়া।
কোকিল কুহু কুহু কূজিত কাননে
কুসুম সবে অনিবারিয়া॥
ফুয়ল মাধবী কুঞ্জ মঞ্জুল
গুঞ্জে ভৃঙ্গক পাঁতিয়া।
হেরি কম্পিত সঘন তনু মন
দহই জনু আগি জারিয়া॥
বিছুরি রহু মোরে নাহ আগর
নাগরী গুণ রতি পাইয়া।
কতহিঁ তুষ্টা সহ বাণ ফুলশর
সহয়ে এ খিণা দেহিয়া॥
সজনি মাস হই বহি জাতি।
মাধব বিনু সরম সুর···নি
দেহ মনমথ পাঁতি॥ ধ্রু॥
মাহ মাধবি অটবি সোহন
নবীন দল পর ফুল্লিয়া।
নবঙ্গ কেশর কুসুম বিকশিত
মল্লি মাধুরী রঙ্গিয়া॥
ভৃঙ্গ ঝঙ্করে মদন রঙ্গভরে
ভৃঙ্গি সঙ্গত রঙ্গিয়া।
পাপ পিকু না হিয়াই বোলত
যাহা পিয়া পরদেশিয়া॥

বহই মন্দ মরুত শীতল
শেল মলয়জ সহিয়া।
মাধব মধুপুরে মানিনী মনোরথ
পুরল হামারে বঞ্চিয়া॥

সজনি মাহ হই বহি যায়।
কণ্ঠস ঐছন আছয়ে পরদেশ
যাই পিয়াকে বুঝায়॥ ধ্রু॥

মাহ জেঠহিঁ কতহিঁ বারব
পাপ চিত পরবোধিয়া।
পাপ হিমকর কিরণ......

ইহার পর পুথির আর কোন পত্র নাই। এই পর্যায় আরম্ভের পূর্বে ইহা বিদ্যাপতি-রচিত বারমাসিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মৈথিল কবির রচনা যে ইহা নয়, তাহার প্রমাণ ইহার মধ্যে সর্বত্র। হেরিয়া, দেহিয়া, দেইয়া, কাটিয়া প্রভৃতি বাংলা প্রয়োগ মৈথিল কবির হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, কবি 'সোঙরি সে সব শ্যাম' এই বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। 'শ্যাম' প্রয়োগ যে বিদ্যাপতির হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই বর্ণনা অগ্রসর হইয়াছে, যদিও জ্যৈষ্ঠের বর্ণনা সমাপ্ত হয় নাই। বিদ্যাপতির শ্রুতিসুখকর মনোমুগ্ধকর ভাষার আশ্রয় কবি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বহুখ্যাত কয়েকটি পদের ভাষার সহিত এই পদের কয়েকটি ছত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। মৈথিল কবির ভাষা অনন্যসাধারণ ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া অপরূপ মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের কাব্যলোক সৃষ্টি করিয়া কবিকে মহৎ প্রতিভারূপে চিহ্নিত করিয়াছে। সেই পরিচয়ের চকিত আভাস এই পদে ধরা যায় সত্য, কিন্তু তাহা যে অনুকৃতিরই ফল, তাহা অনস্বীকার্য। শুধু এই পদটিই যে বিদ্যাপতির ভণিতায় একমাত্র বারমাসিয়া পর্যায়ের পদ তাহা নয়, ডক্টর সুকুমার সেন বিদ্যাপতি ভণিতায় আরও 'একটি বাংলা পদ'-এর 'আরম্ভ ও শেষ' অংশ প্রকাশ করিয়াছেন (বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী, পৃঃ ৫৭)।

মাঘেতে মাধব কৈল মথুরা গমন
দশ দিগ শূন্ত দেখি আর বৃন্দাবন।……
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
তিলেক ধৈরজ কর মেলিবে মুরারি॥

এই পর্যায়ের পদগুলি আর যাহাই হউক, কবিসম্রাট বিদ্যাপতির রচিত নয়, তাহা অনস্বীকার্য। রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতি-কৃত পদই এই পদগুলির নির্ভর-ভূমি বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে।

বাংলা দেশের কবি-সমাজ বিদ্যাপতিকে কেন্দ্র করিয়া নানা ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই সকল পদগুচ্ছ তাহারই প্রমাণ।

সূর্যপূজা ও জটিলা-কুটিলার সৃষ্টি শ্রীরূপ গোস্বামীর। অথচ বিদ্যাপতির ভণিতায় এই জাতীয় পদ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয় লিখিয়াছেন, "শ্রীরাধার সূর্যপূজা করিতে যাওয়া শ্রীচৈতন্তের অনুবর্তী পদকর্তাদের অনুভব। বিদ্যাপতির কোন অকৃত্রিম পদে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, ললিতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতির নাম নাই। এই নামগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের দ্বারাই বহুলাংশে প্রচারিত হইয়াছিল, যদিও পুরাণাদিতে এই সব নামের অন্ততঃ কতকগুলি পাওয়া যায়।" (বিদ্যাপতি পদাবলীর ভূমিকা: ৫॥৶০) বিদ্যাপতির ভণিতায় এই শ্রেণীর চারিটি অপ্রকাশিত পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১

পূজইতে সুরজ সুধামুখি সুন্দরি
গুরুজনে মাগল ভাস।
দিনকর দেবে পূজনে হাম যায়ব
পূরব মন অভিলাষ॥
মধুর বচন জটিলে কহত বানী
কুটিলে সঙ্গে চলি যাহ।
পন্থহি বিঘটিত যদি পুনু হয়ত
আয়রি ফিরি পুনু নিজ গেহ॥

এত শুনি কুটিলে কোপ করি কহত
হাম না যায়ব অছু সাথে।
দুই কুল কামিনী এত কহে চাতুরী
মোর মন যাউক নিপাতে॥
উনরি বচনে অনুমতি দেয়বি
খুয়ায়বি কুল মরিজাদে।
শ্যাম সম্ভাষণে যায়ব সুন্দরি
বুঝিলে বুঝসি নাহি কাজে॥
কুটিলে বচন শুনি মিনতি করয়ে ধনি
বোলত মধুরিমে বানী।
বিদ্যাপতি কহে ধিক্ বহু জীবনে
যে জন হয়ত পরাধিনী॥ (ক. বি. ৩৩৮, পত্র ৮)

২

জটিলে বেথিত হই সব দেখ নয়ন
সখীগণ করে করি লেল।
হাসি হাসি চামর লেয়ল সুন্দরি
মনে মনে উলসিত ভেল॥
রতন থারি পুরি উপচার লেয়ল
মাক্ষণ ননী মিছাই।
অধিবাস রক্ত অম্বর কদলী ফল বহু
লেয়ল বিবিধ মিঠাই॥
সুন্দরী সুমঙ্গল সোম এ সখিরে উচ্চারল
দিনমনি পূজল জানি।
বিদ্যাপতি কহে গতি অতি মন্থর
সাজল সকল কামিনী॥ (ক. বি. ৩৩৮, পত্র ৮)

৩

সখীগণ সঙ্গে চলত বররঙ্গিনী
পূজইতে দিনকর নাথে।
শ্যাম প্রেম কথা কহিতে না পায় ধনী
কুটিলে চলত ভছু সাথে॥

রাই ভায় এ মনে ধন্দ।
কোন ছলা করি কুটিলে বেরাগিনী
পাপিনী ছোড়ব সঙ্গ ॥
বহু মন মন্তনা করি ধনি ভাবই
অন্তনা বেঢ়ল মোয়।
সখীগণ জনে জনে দ্বন্দ্ব বড়ায়ই
কোন ছলে বেঘটিত হোয় ॥
সখীগণ জবে জনে পুছত সুন্দরি
মুরছিত হিত নাই থান।
বুঝ মন ভাঙে ভুলি চলি আয়লু
দগদগি হয়ত পরাণ ॥
বিশাখা কহতহি শুনহ সুন্দরি
ছাড়ায়লি তহি ফুল।
শুনি ধনি কুটিলে করে ধরি কহত
পালটি করহ অনুকূল ॥
কুটিলে কহতহি যদি হাম জায়ব
পালটি না যায়ব আর।
বিদ্যাপতি কহে শাপে বর হয়ল
ঘুচিল কণ্টক ভার ॥

(ক. বি. ৩৩৮, পত্র ৮)

৪

জটিলা পাশ ফুকরি তহি বোলত
বোহুরি বেড়ি কাহে থারি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতি পতিভয় অতি গাড়ি ॥
শুনি কহে জটিলা ইটিল কিয়ে অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পানি ধরি হেরহ কিয়ে
অকুশল কহ মোয় ॥

যোগেশ্বর হরি বহুরিক পানি ধরি
কুশল কবর বনদেব।
দুই এক অঙ্ক বঙ্ক বিসঙ্কউ
ধনহু পশুপতি সেব॥
পূজক তন্ত্র মন্ত্র বহু আছয়ে
সোহই কিছু নাহি জান।
জটিলা কহত আন দেব কাহে পাওব
তুহুঁ বীজ কর ইহ দান॥
এত কহি তুহুজন মন্দিরে পরবেশল
দুহুজন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র তন্ত্র পড়ায়ল
দুহুঁজন পূরল কাম॥
পুনঃ দুহুজন মন্দির যাহা নিকসল
জটিলা মনে করি ভাখি।
যব হই গৌরী আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি॥
এত কহি সবহু চলল নিজ মন্দিরে
যোগী চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধী চলল মনকাম॥ (পাঁচথুপীর পুথি, পদ ১১৬)

সূর্যপূজার কথা উপর্যুক্ত প্রথম তিনটি পদের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্যপূজার বর্ণনা চৈতন্য-পরবর্তী কালের মহাজন পদকর্তা-গণের সৃষ্টি। এই পদ কয়টি যে চৈতন্য-পরবর্তী কালের, তাহা উপর্যুক্ত সূত্র অনুসারে বলা চলে। প্রসঙ্গত, বিদ্যাপতির পদের আকর গ্রন্থসমূহ বিচার করিলে দেখা যায় যে, কবি কোথাও শ্যামনাম ব্যবহার করেন নাই। তৃতীয় পদের তৃতীয় ছত্রে 'শ্যাম প্রেম কথা' কবি বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় পদের ভণিতায়ও বিদ্যাপতির বদলে 'বিদ্যাপতি কহে' দেখা যায়। পদসমূহের আভ্যন্তরীণ বিচারে চৈতন্য-পরবর্তী কালের রচনা না বলিয়া

উপায় নাই। চতুর্থ পদে জটিলা কুটিলা ললিতা সখীগণের বর্ণনা যে চৈতন্য-পরবর্তী কালের প্রভাব, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বাঙ্গালী কবির রচিত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদসমূহের আলোচনার আভ্যন্তরীণ বিচারে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িয়াছে, তাহা দেখানো হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার পূর্বে বিপরীত রতি পর্যায়ের একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পদমধ্যে কবি যে বিদ্যাপতির কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার সরল স্বীকারোক্তি মিলিয়াছে।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপল ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উতপল চন্দ॥
ফণি মণিবর নিরখি শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু শিখরে সব তরঙ্গিনী কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিনী কঙ্কন করু কন রব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরি জতি কহু
ঐছন সকল শোহে॥
না কর গোপন নিজ পরিজন
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃপায়ে তাহারি কোন জন
ইহা গান॥ (বরাহ ৩০ দ, পত্র ২৩, ক.বি. ৬২০৪)

বিপরীত রতি পর্যায়ের এই পদটি কবি যে বিদ্যাপতিরই কৃপায় এই পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার সরল স্বীকারোক্তি। এরূপ স্বীকারোক্তি বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত সাহিত্যে বিরল। কিন্তু ইহার সূচনা রাধামোহন ঠাকুরের কাল হইতে। পদামৃতসমুদ্র-কার এই পদটির অন্তর্ভুক্তির (২৩২) মধ্য দিয়া বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত বাঙালী-কবিসমাজের প্রতি প্রায় প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদসমুদ্রে এই ‘কৃপা’-র প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রায় সর্বত্র।

পরিশিষ্ট (ক)

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা

অঃ—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (১৩২৭)।

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি।

কী.—কীর্তনানন্দ।

কী. অপ্র.—বরাহনগর পাঠবাড়ীতে রক্ষিত কীর্তনানন্দের অপ্রকাশিত সম্পূর্ণ প্রাচীন পুথি (২৭ ও ২৮ সংখ্যক)।

গী.—গীতচন্দ্রোদয়।

তরু অথবা প. ত.—পদকল্পতরু।

মি.-ম.—মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী।

প. র.- পদরত্নাকর।

প. র. সা.—পদরস সার।

বরাহ—বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুথিশালায় রক্ষিত পুথি।

সা. প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি।

সমুদ্র—পদামৃতসমুদ্র।

ক্ষণদা—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।

ন. গু.—নগেন্দ্র গুপ্তের বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী।

রা. গ.—রাগতরঙ্গিণী।

বৃ.—বৃন্দাবনের পদাবলীর খাতা।

কা.—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বঙ্গীয় পদাবলী।

হ. ম.—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী।

সা. প. প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

পরিশিষ্ট (খ)

পুথি-পরিচয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি

ক. বি. পুথি—৩২৪ ; ১৩½" × ৪¾"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১২ হইতে ৩২)। ২১—৫০-সংখ্যক পর্যন্ত পদ বিদ্যাপতির। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বল্লভদাস প্রভৃতি পদকর্তাগণের রচিত পদের সংকলন। পুথিতে কোন লিপিকাল উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা সংকলিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-বিবরণীতে ইহাকে ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ক. বি. পুথি—৩২৭ ; ১০" × ৩½"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ৮)। ১—২৯টি পদের সংকলন। বাসুঘোষ, মোহন দাস, নরহরি, জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বংশীবদন, বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথির কোন লিপিকাল নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-বিবরণীতে ইহা ১৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর পুথি—এরূপ অনুমান করা চলে।

ক. বি. ৩৩০ ; ২'—২" × ১'—৬"

১ পত্রেই ৯টি পদ সংকলিত হইয়াছে (সম্পূর্ণ)। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচনদাস, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতির পদ সংকলিত হইয়াছে। লিপিকাল নাই। পত্রের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনুলিপিকৃত।

ক. বি. ৩৩১ ; ১'—১" × ৪½"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ৯৩)। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, বংশীবদন প্রভৃতি পদকর্তার পদের অনতিবৃহৎ পদসংগ্রহ-গ্রন্থ। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনুলিপিকৃত।

ক. বি. ৩২৮ ; ১'—১" × ৪½"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ২ হইতে ৯)। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির পদ সংকলিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের অনুলিপি বলিয়া মনে হয়।

ক. বি. ৩৩৪ ; ১'—২" × ১০½"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ৫)। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ২৬টি পদের সংকলন। লিপিকাল নাই।

ক. বি. ৩৩৮ ; ১০২″× ৫″

সম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ২৩)। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, চন্দ্রশেখর, লোচনদাস প্রভৃতির পদের সংকলন। লিপিকাল নাই।

ক. বি. ৩৩৩ ; ১′—১″× ৪২″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ২)। বিদ্যাপতি, বাসুঘোষ ও নরহরির পদ-সংগ্রহ। লিপিকাল নাই।

ক. বি. ৩৩৯ ; ১′—১২″× ৫″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ১৭)। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, বৃন্দাবন-দাস, শেখর প্রভৃতির পদ-সংগ্রহ। লিপিকাল নাই।

ক. বি. ৩৪১ ; ১′—১″× ৫″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ৩)। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের পদ-সংগ্রহ। লিপিকাল নাই।

ক. বি. ৩৪২ ; ১′—৩২″× ৫২″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১৪ হইতে ১৯)। অধিকাংশই মাথুরের পদ। গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, বাসুঘোষ, রাধাদাস প্রভৃতি পদকর্তার পদ আছে। কোন লিপিকাল নাই।

ক. বি. ৩৪৩ ; ৯″× ৪″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ৯) । রসোদগারের পদ-সংগ্রহ। পদকর্তা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, বাসুঘোষ, শেখর প্রভৃতির পদ আছে। লিপিকাল নাই। দুই হাতের লিপি।

ক. বি. ২৩৮১ ; ১′—১″× ৫″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ৯)। লিপিকাল নাই। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রায়-শেখর প্রভৃতির পদ আছে।

ক. বি. ২৩৮৩

পনেরটি বিভিন্ন আকারের পাতা। সব কয়টিই বিভিন্ন পুথি হইতে সংগৃহীত। প্রতিটি পত্রেই স্বতন্ত্র হস্তাক্ষর। লিপিকাল নাই।

ক. বি. ২৩৯৩ ; ১′—১″× ৪″

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১২)। লিপিকাল নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ-দাস প্রভৃতির পদ আছে।

ক. বি. ২৩৯৬

বিভিন্ন আকারের সাতটি পত্র। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদ আছে।

ক. বি. ৩২৬৬ ; ৯½"×৫½"

খাতার আকারে ২০টি পত্র বাঁধা আছে। বিদ্যাপতি ও যদুনন্দনের পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ৭ম ও ৯ম পত্রে 'সন ১১৭১ সাল' এবং ২০-সংখ্যক পত্রে 'মাহ বৈশাখ' উল্লিখিত হইয়াছে। একটি মূল্যবান পদ-সংগ্রহের পুথি।

ক. বি. ৩৪৩৬ ; ১১½"×৫½"

খাতার আকারে ১—২৫ পত্রে সম্পূর্ণ। ১২৭২ সালে অনুলিপিকৃত। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাস, চৈতন্যদাস, নরোত্তম প্রভৃতির পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

ক. বি. ৩৬৬৫ ; ১'—৩"×৫"

পত্রসংখ্যা ১—৫। 'মাথুর বিরহ গৌরচন্দ্রী সমেত দ্বাদশ পদাবলি সমাপ্ত'। লিপিকাল নাই। পদকর্তা—বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রায় শেখর, লোচনদাস, ঘনশ্যাম, নৃপতি এবং ভূপতি।

ক. বি. ৩৭৪৭

বিভিন্ন আকারের ৭টি পাতা। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ আছে।

ক. বি. ৩৭৪৭

নয়টি বিভিন্ন পত্রের সমষ্টি। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদ আছে।

ক. বি. ৪৩৯৫ ; ৯½"×৭½"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ৫৬ হইতে ৬০)। লিপিকাল নাই। পদকর্তা—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোচন, রামানন্দ প্রভৃতি।

ক. বি. ৪৪৭৫ ; ৯½"×৫"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১—২)। বিদ্যাপতি এবং মুরারীর পদ আছে। হস্তলিপি খুব প্রাচীন। সপ্তদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

ক বি. ৪৫১৩ ; ১'—১"×৪"

অসম্পূর্ণ (পত্রসংখ্যা ১ হইতে ৭)। লিপিকাল নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদ আছে।

ক. বি. ৪৫৩১ ; ১'—২"×৪"

পাঁচটি বিভিন্ন আকারের পত্র। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদ আছে।

ক. বি. ৪৫৪৯ ; ১'—৫"×১'—২"

একটি পত্র মাত্র। '১১৭০ সাল তাং ২৩ ভাদ্র বুধবার তিথি দশমী গোধূলি সময়ে সমাপ্ত হইল।' অধিকাংশ পদই ভূপতিনাথের। পুথিটি ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিপিকৃত, সেইজন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক. বি. ৪৫৫১ ; ১′—৫″ × ৭$\frac{১}{২}$″

একটি পত্র মাত্র। লিপিকাল নাই। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ আছে।

ক. বি. ৬২০৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক দুই সহস্রাধিক পদ সংকলিত হয়। প্রায় সকল মহাজন পদকর্তার পদই এই সংগ্রহে আছে। ১২৮৫ সালে ইহা অনুলিপিকৃত।

বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুথিশালায় রক্ষিত

২২-সংখ্যক পুথি ; ১৩″ × ৪$\frac{১}{৪}$″

পত্রসংখ্যা ২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী নামে পুথিটি চিহ্নিত। পদের সংখ্যা ২০৬। লিপিকাল নাই ; তবে লিপি দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা দেড শত বৎসরেরও পূর্বেকার।

বরাহ ২৬ ; ৭″ × ৪″

পত্রসংখ্যা ২০১। নবদ্বীপ ব্রজবাসী কর্তৃক বিভিন্ন পদকর্তার পদের সংকলন।

বরাহ ২৬-ক ; ৮$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″

আটটি পত্রের সমষ্টি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রায়শেখর প্রভৃতির পদ আছে। লিপিকাল নাই।

বরাহ ২৬-ঙ, ৭$\frac{১}{২}$″ × ৫$\frac{১}{৪}$″

পত্রসংখ্যা ১—১৪। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদ আছে। লিপিকাল ১২৭৭ সাল।

বরাহ ২৬-ছ ; ১১$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″

৩৮১—৪০৫ পত্র। অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন পদকর্তার পদ আছে।

বরাহ ২৬-ত ; ১৫″ × ৪$\frac{৩}{৪}$″

১—১১ পত্র। অসম্পূর্ণ। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদ আছে। লিপিকাল নাই।

বরাহ ২৬-ব ; ১২$\frac{১}{২}$″ × ৪$\frac{১}{২}$″

একটি পত্র মাত্র। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদ আছে।

বরাহ ৩০-দ ; ১০$\frac{১}{৪}$″ × ৪″

১৯—৩০ পত্র। অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন পদকর্তার পদ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনুলিপিকৃত বলিয়া মনে হয়।

বয়াহ্ ৩১ ; ১'—২"×৪½"

১—১১ পত্র। অসম্পূর্ণ। লিপিকাল ১২২৭ সাল। বিভিন্ন পদকর্তার পদ আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত

১৮১-সংখ্যক পুথি। মোট ৪টি বিচ্ছিন্ন পত্র আছে।

সা. প. ২৪৩৩

৯ খানি বিভিন্ন আকারের খাতা একত্র আছে। বিদ্যাপতি, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস প্রভৃতি বহু পদকর্তার পদ আছে।

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি

নবদ্বীপের নিত্যধামগত অদ্বৈতদাস বাবাজী মহোদয়ের স্বহস্ত লিখিত ৪৮ পত্রের বিদ্যাপতি পদসংগ্রহের একখানি খণ্ডিত পুথি। তদীয় পৌত্র ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয়ের নিকট ইহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

১২০০ সালের নিজস্ব পুথি

পুথি সংগ্রহ করিতে গিয়া খাতার আকারে ইহা পাই। বিভিন্ন পদকর্তার প্রায় দুই শতাধিক পদ ইহাতে আছে। কয়েকটি পত্রে এবং খাতার শেষে ১২০০ সাল দেওয়া আছে।

১০৯৬ সালের নিজস্ব পুথি ৮½"×৭"

২১ পত্রের সম্পূর্ণ পুথি। পুথির বিভিন্ন পত্রে ১০৯৬ সাল লেখা আছে। বিদ্যাপতি, যদুনন্দন ও কৃষ্ণদাসের পদ-সংগ্রহ। লিপি খুব প্রাচীন।

পাঁচথুপীর পুথি

মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপী গ্রামের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত রামগোপাল আচার্য মহোদয়ের পুথি। লিপিকাল নাই, তবে পুথিটি বেশ প্রাচীন। মোট পদের সংখ্যা—১১৪৫।

পরিশিষ্ট (গ)

অপ্রকাশিত পদগুচ্ছের সূচী*

প্রথম ছত্র | **পৃষ্ঠা**

প্রথম ছত্র	পৃষ্ঠা
অনুমতি লেই তুঁহারি হাম এহ	৪১
অব কি করব প্রতিকার	৬৭
ইন্দ্র আদি করি সুর নর দানব	৬৭
উধো কুশল কহ	১৭৮
উভে কর নিশানি রঙ্গনীমণি	১৭৩
এত কহিতে সখি	৫১
এত দিন সো বিহি	১৬৭
এমন পিয়ার কথা	৮৯
এ ধনি সুন্দরি শুন মধু বাণী	১৩২
এ হরি জানি করহ মোরে রোখ	১৭১
এ হরি মাধব কি কহিব আন	৮৮
কামিনী যামিনী কাহিনী গেল	৩৯
ক্ষেমহ এক অপরাধ	৪২
গোপত পিরীতি রস বেকত হোই	৪২, ৯৪
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি	৫০
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জবর গমনি	১৭৩
জটিলে ব্যথিত হই	১৮৬
জটিলা পাশ ফুকরি তহি	১৮৭
জলের উপরে আনন ভাসন	৮৯
ঝাঁপলু কূপ লখই ন পারই	৬৪
তুয়া বচনে হাম কুঞ্জে পয়ান	৩৮
তুহুঁ যদি যাওবি চিহ্ন কিছু দেয়বি	৭৭
তুহুঁ সখি পরাণ দোসর মোর	১৩০

* 'গোপত পিরীতি রস' এবং 'সায়রে মরিব সখি' পদদ্বয় গ্রন্থমধ্যে দুইবার 'উদ্ধৃত হওয়ায় ভ্রমক্রমে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ পংক্তিতে '৭১টি নূতন পদ' উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে '৬৯টি নূতন পদ' হইবে।

প্রথম ছত্র	পৃষ্ঠা
দেখ নাগরি বেশ বনায়ত কান	৪১
দেখ সখি দুঁহে দুহুঁ মিলল ভেলা	১৭০
দুহুঁ সুমতি নাহি ভেলা	৩৮
দূতী কহে শুন নিরদয়	১৭৭
দীন দয়াময় জগমন মোহন	৭২
ধনি মুখ বিলসে নাহিক ওর	১৭১
নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন	১২৭
পরকীয়া রতি কেমন বরণ	৯৩
পরদেশী ভঞি পিয়া	১৭৬
পার লিখি যে আন	৮০
পিরীতির ঘরে পরাণ পসিল	৯০
পূজইতে সুরজ সুধামুখী সুন্দরী	১৮৫
প্রথমাবস্থা দেহ হামারা	১৭৪
বনমালী বন তেজি কর অবধান	৭৩
বহুদিনে রে সখি জানি ভালে হাম	৬৯
বালি বিলাসিনী আকুল কান	৪৩
বিদ্যাপতি কবিশিখরে বসি	৯৭
বৃষভানু কিশোরী অতি খিনা	১৬৬
ভালে মাধব রাই একঠাম	১৭০
মদন মদালসে শ্যাম বিভোর	১৬৫
মন্দির ছোড়ি পহিল পদ আরোপিতে	১৭২
মাধব রাধা আজি স্বাধিনী ভেল	৫০
মাধব সঙ্কটে লেহ ভরাই	৬৮
মাধব জনমে জনমে করি আশ	৭০
মাধব বেরি এক কর অবধান	৭১
মাঘ আঘন নহে মধুর	১৮১
মানুষ মানুষ নিগূঢ় কথা	৯২
মানুষ বলিয়া কেমনে জানিব	৯১
যব হরি কুচ যুগ বহই	১৬৮

প্রথম ছত্র	পৃষ্ঠা
রাই রাই করি ফুকরই কান	১৬৮
লছিমা আমার স্বরূপের গুরু	৮৮
শুনইতে ধাই লছিমা আয়ল	৭৩
শুন প্রাণ পিয়া একমন হইয়া	৯০
শুন হে কুটিলে তুমি বড় খল	১৭৬
শুন হে উদ্ধব সাধিব কি	১৭৯
শূল শেল যব মরমহি পৈঠল	৬৫
শূলক মাঝে পড়ল তিন জন	৭৮
শূলে পড়ল কবিরাজ	৭৯
সখীগণ সঙ্গে চলত বররঙ্গিনী	১৮৬
সজ্যাতিনী নাগর চৌরস আপনা	৪৯
সায়রে মরিব সখি	৪৯, ১৬৫
সুন্দরি কানু পিরীতি করু রোখ	১৬৭
সুন্দরী স্বপনে দেখলা	৪০
সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম	১৮০
হরি গলে লাগল চম্পক মালা	১৬৯
হে সখি হিত বচন কিছু শুন	৯৩

পরিশিষ্ট (ঘ)

বিদ্যাপতি-চর্চা

বাংলা ঃ

১। পুরুষ পরীক্ষা—হরপ্রসাদ রায় অনূদিত। শ্রীরামপুর ১৮১৫

২। পুরুষ পরীক্ষা—জি. হফটন কর্তৃক প্রকাশিত। লণ্ডন ১৮২৬

৩। পুরুষ পরীক্ষা—পৃষ্ঠা ৩+১৮৬। কলিকাতা ১৮৫০ ?

৪। বঙ্গভাষার উৎপত্তি—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ, পঞ্চম পর্ব। ১৭৮০ শকাব্দ (১৮৫৮ খ্রীঃ)

৫। পুরুষ পরীক্ষা—পৃষ্ঠা ৩+১৮৫। কলিকাতা ১৮৬৫ ?

৬। পুরুষ পরীক্ষা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনূদিত। ২য় সংস্করণ ১৮৬৬

৭। কবি চরিত—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৮৬৯

৮। বঙ্গভাষার ইতিকথা—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৮৭১

৯। বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কলিকাতা ১৮৭২

১০। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। কলিকাতা ১৮৭৩

১১। মহাজন পদাবলী—জগবন্ধু ভদ্র। কলিকাতা ১৮৭৩

১২। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (অসম্পূর্ণ, ১ম—৩য় খণ্ড), চুঁচুড়া ১৮৭৪—৭৬

১৩। বিদ্যাপতি ও জয়দেব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ সাল

১৪। মহাজন পদাবলী সংগ্রহ—১ম খণ্ড, ১ম ভাগ (বিদ্যাপতি), চুঁচুড়া ১২৮০

১৫। বিদ্যাপতি—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন, ১২৮২ সাল (১৮৭৫)

১৬। বিদ্যাপতির পদাবলী—সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত। কলিকাতা ১২৮৫ সাল

১৭। বিদ্যাপতি পদাবলী—অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। চুঁচুড়া, ১৮৭৮

১৮। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (দুই খণ্ড)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। কলিকাতা ১৮৮৪-৮৫

১৯। পদরত্নাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। কলিকাতা ১২৯২

২০। বিদ্যাপতি পদাবলী—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩০১ সাল

২১। কবি বিদ্যাপতি—ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা ১৮৯৫

২২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন। কলিকাতা ১৮৯৬

২৩। শব্দের তালিকা (প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাপতির পদাবলীতে ব্যবহৃত কঠিন শব্দ-সমূহের তালিকা)—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা।

২৪। শৈবসর্বস্ব—মূল পাঠ হইতে ভাগ্যবান বিদ্যালঙ্কারকৃত অনুবাদ। কলিকাতা ১৮৯৭

২৫। বিদ্যাপতি পদাবলী—কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা ১৮৯৮

২৬। বঙ্গভাষার লেখক—'বঙ্গবাসী'-প্রকাশিত। ১৯০১

২৭। বৈষ্ণব পদাবলী (১ম)—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৩০৪

২৮। নব-আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদাবলী—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯০০

২৯। মহাজন-পদাবলী (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি)—অক্ষয়কুমার দে সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯০৩

৩০। বৈষ্ণব পদাবলী—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯০৫

৩১। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৯০৯

৩২। বিদ্যাপতি (পদ-সংগ্রহ)—কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ। ৩য় সংস্করণ, ১৯১০

৩৩। বৈষ্ণব পদলহরী—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩১২

৩৪। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩২২

৩৫। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—শিবরতন মিত্র। কলিকাতা ১৩৩৬

৩৬। বিদ্যাপতি—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯৩৪

৩৭। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৩৫

৩৮। বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী—সুকুমার সেন। কলিকাতা ১৯৩৬

৩৯। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—গৌরগুণানন্দ ঠাকুর। গৌরাব্দ ৪২৪

৪০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)—সুকুমার সেন। কলিকাতা ১৯৪০

৪১। শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়—নরহরি চক্রবর্তী। হরিদাস দাস সম্পাদিত। গৌরাব্দ ৪৬২

৪২। শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী—জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩৪২

৪৩। বিদ্যাপতি পদাবলী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। ১৩৪১

৪৪। বৈষ্ণব রস সাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কলিকাতা ১৯৫৩

৪৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৩৫৩

৪৬। বিদ্যাপতির পদাবলী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩৫৯
৪৭। বিদ্যাপতি-শতক—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা ১৯৫৪
৪৮। বিচিত্র সাহিত্য (২য়)—সুকুমার সেন। কলিকাতা ১৩৬৩
৪৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (২য়, ৩য়, ৪র্থ)—হরিদাস দাস। নবদ্বীপ, গৌরাব্দ ৪৭১
৫০। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা
৫১। সাহিত্য পত্রিকা (সতীশচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাপতি বিচার' প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ) মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত। ঢাকা ১৩৬৭
৫২। হরপ্রসাদ রচনাবলী (২য়)—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কাঞ্জিলাল সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯৬১
৫৩। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য—বিমানবিহারী মজুমদার। কলিকাতা
৫৪। বিচিত্র নিবন্ধ—সুকুমার সেন। কলিকাতা ১৯৬১
৫৫। বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯৬১
৫৬। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৯৬২
৫৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা
৫৮। বিবিধ প্রবন্ধ—শঙ্কর সেনগুপ্ত ও অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত। কলিকাতা

সংস্কৃত, হিন্দী, মৈথিলী ও গুজরাতী :

১। পুরুষ পরীক্ষা—সংস্কৃত হইতে হিন্দীতে তারিণীচরণ মিত্র কর্তৃক অনূদিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কলিকাতা ১৮১৫
২। পুরুষ পরীক্ষা—গোবিন্দজী শাস্ত্রী-কৃত গুজরাতী অনুবাদ। বোম্বাই ১৮৮২
৩। পুরুষ পরীক্ষা—চন্দ্রনাথ ঝা কৃত মৈথিলী অনুবাদ। দ্বারভাঙ্গা ১৮৮৮
৪। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। (মূল পাঠ)। দ্বারভাঙ্গা ১৮৯০
৫। মহামহোপাধ্যায় কবিবর বিদ্যাপতি ঠাকুর—কমলানন্দন সিংহ। এলাহাবাদ ১৯০২
৬। মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি—ব্রজনন্দন সহায় সম্পাদিত। পাটনা ১৯১০
৭। বিদ্যাপতি ঠাকুর কি পদাবলী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এলাহাবাদ ১৯১০
৮। হিন্দী পুরুষ পরীক্ষা—মহেশ্বর প্রসাদ অনূদিত। এলাহাবাদ ১৯১২
৯। হিন্দী পুরুষ পরীক্ষা—সরকারী বিদ্যালয়ের প্রবীণ সংস্কৃত শিক্ষক কর্তৃক অনূদিত। এলাহাবাদ ১৯১৫

১০। রাগতরঙ্গিণী—লোচন। বলদেব মিশ্র সম্পাদিত। দ্বারভাঙ্গা ১৩৩১

১১। বিদ্যাপতি কি পদাবলী—রামবৃক্ষ বেণীপুরী সম্পাদিত। লাহোর ১৯২৬

১২। বিদ্যাপতি কি পদাবলী—কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ কর্তৃক পরিমার্জিত সংস্করণ। লাহোর ১৯৩১

১৩। কীর্তিলতা—বাবুলাল সাকসেনা কৃত গদ্য অনুবাদ। এলাহাবাদ ১৯২৯

১৪। হিন্দী গীতিকাব্য—রাজকুমার বর্মা সম্পাদিত। এলাহাবাদ ১৯৩২

১৫। মহাকবি বিদ্যাপতি—শিবনন্দন ঠাকুর। পাটনা ১৯৪১

১৬। বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি পদ্যাবলী—শিবনন্দন ঠাকুর সম্পাদিত। দ্বারভাঙ্গা ১৯৪১

১৭। হিন্দী কবি চর্চা—চন্দ্রাবলী পাণ্ডে। বেনারস ১৯৪৮

১৮। বিদ্যাপতি—জনার্দন মিশ্র

১৯। বিদ্যাপতি ঠাকুর—উমেশ মিশ্র

২০। বিদ্যাপতি—শিবপ্রসাদ সিংহ। বেনারস ১৯৫০

২১। বিদ্যাপতি—লালদেবেন্দ্র সিংহ ও সূর্যবলী সিংহ সম্পাদিত। বেনারস ১৯৫০

২২। বিদ্যাপতি পদাবলী—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। পাটনা ১৯৫১

২৩। বিদ্যাপতি পদামৃত—ওঁঙ্কারনাথ মিশ্র। এলাহাবাদ ১৯৫১

২৪। বিদ্যাপতি কি পদাবলী—বসন্তকুমার মাথুর। দিল্লী ১৯৫২

২৫। বিদ্যাপতি গীতসংগ্রহ—সুভদ্র ঝা সম্পাদিত। বেনারস ১৯৫৪

২৬। কীর্তিলতা ঔর অবহট্‌ঠ্ ভাব—শিবপ্রসাদ সিংহ সম্পাদিত। বেনারস ১৯৫৫

২৭। হিন্দী ভক্তিশৃঙ্গার—মিথিলেশ কান্তি।

২৮। বিদ্যাপতি ঔর উন্‌কি কবিতা—সতীশচন্দ্র রায়। এলাহাবাদ

২৯। বিদ্যাপতি কা অমর কাব্য—গুণানন্দ জয়মল। কানপুর

৩০। বিদ্যাপতি পদ্য-সংগ্রহ—সতীশচন্দ্র রায়। এলাহাবাদ

৩১। গীতকার বিদ্যাপতি—রামবাশিষ্ঠ।

৩২। বিদ্যাপতি পদাবলী—বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্ প্রকাশিত। পাটনা

৩৩। বিদ্যাপতি: এক তুলনাত্মক সমীক্ষা—জয়কান্ত নলিন। আগ্রা ১৯৫০

৩৪। বিদ্যাপতি কি কাব্যসাধনা—দেশরাজ সিংহ ভাটী।

৩৫। সাহিত্য সন্দেশ (বিদ্যাপতি বিশেষাঙ্ক)—জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। আগ্রা

৩৬। বিদ্যাপতি: যুগ ঔর সাহিত্য—অরবিন্দনারায়ণ সিন্‌হা। আগ্রা

ইংরাজী :

১। A View of the History, Literatuıe and Mythology of the Hindoos—W. Ward. 2 Vols. Second Edition; Sreampore, 1818.

২। The Early Vaishnava Poets of Bengal—I: "Bidyapati" —John Beams Indian Antiquary, Vol. II (1873).

৩। On the Age and Country of Bidyapati—John Beams. Indian Antiquary, Vol. IV (1875).

৪। An Introduction of the Maithili of North Bihar, Chrestomathy and Vocabulary—G. A. Grierson. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XLIX, XLI, Calcutta 1880—82.

৫। Vidyapati and His Contemporaries—G. A Grierson. Indian Antiquary, Vol. XIV, 1885.

৬। The Modern Vernacular Literature of Hindusthan—G. A Grierson, Calcutta, 1889.

৭। The Poets of Bengal—Kaliprasanna Kavyavisharad, Calcutta 1894 (3rd Editeon 1910)

৮। A Reduced Facsimile of the Grant of the Village of Bisapi by Sivasinha to Vidyapati—G. A Grierson. Proceedings of the Asıatic Society of Bengal, August, 1895

৯। On the Genuineness of the Grant of Siva Sinha to Vıdyapati Thakura—G A. Grierson. JASB Vol.LXVII—Part I. 1899.

১০। On Some Mediaeval Kings of Mithila—G A Grierson. IA. Vol. XXVIII, 1899

১১। Vidyapati Thakur—Nagendranath Gupta. JASB, Vol. LXXIII, Part I. 1904.

১২। Catalogue of Palm Leaf Manuscripts in Nepal Darbar, ©05

১৩। Vidyapati Thakur—G. A Grierson. JASB, Part I. 1905.

১৪। History of Bengali Language and Literature—D. C. Sen. Calcutta 1911.

১৫। Bangiya Padavali (Songs of the Love of Radha and Krisna) Translated by A. Coomersway & Arun Sen. London 1915.

১৬। History of Trihut, from the earliest times to the end of the 19th Century—Shyamnarayan Singh Calcutta. 1922.

১৭। Vaishnav Lyrics Done into English Verse—Surendra Nath Kumar, Nandalal Datta & John Alexander Chapman. Preface by J. C. Chapman. With Glossary. Calcutta 1923.

১৮। Kirtilala—Text with Bengali and English Translations Edited by Haraprasad Shastri. Calcutta 1924.

১৯। The Origin & Development of the Bengali Language and Literature—S K. Chatterji. 1926.

২০। The Test of Man, being the Purusa Pariksha of Vidyapati Thakur—English Translation with an Introduction by G. A. Grierson. London 1935.

২১। A History of Brajabuli Literature—Sukumar Sen. 1935

২২। Bhanitas in Vidyapati's Padas—B B. Majumdar. Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Part IV 1942.

২৩। Mithila in the Age of Vidyapati—Biman Behari Majumdar. B. N. College Magazine. Patna. 1943

২৪। Mithila Poets in the Age of Vidyapati—Biman Behari Majumdar. Patna University Journal, Vol. IV. No 1.

২৫। The Rambhadrapur Mss containing Vidyapati's Songs—B. B. Majumdar. JBORS, Vol. XXXIV.

২৬। The Age of Vidyapati—M Sahidullaha. Indian Historical Quaterly, Vol XX. 1944

২৭। A History of Maithili Literature: 2 Vols—Jaikanta Mishra Allahabad. 1949

২৮। Vidyapati-Geet-Samgraha or The Songs of Vidyapati—Subhadra Jha. Banaras 1954.

২৯। Songs of Vidyapati—Aurobindo Ghosh Pondichery, 1956.

৩০। Facsimili of Gorakshavijay—Edited by Umesh Mishra & Jaykanta Mishra. Allahabad.

৩১। A Study of Vaisnavism in Ancient and Medieval Bengal—S. C. Mukherji. Calcutta.